হাওর

অংকুর বর

হাওর

অংকুর বর

সূচীপত্র

পর্ব এক

১) হাওরের হাওয়া হাওরের পানি

মেয়েটি চোখ খুলে কয়েক মুহূর্ত একই ভাবে পড়ে রইল। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এই অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।
আচমকা ঘুম ভেঙে উঠলে কিছুটা যেমন সময় লাগে ধাতস্ত হতে, মেয়েটি এই মুহূর্তে সেই অবস্থায়। কিছুক্ষণমাত্র সময় তারপরই কী একটা মনে পড়ে আঁতকে উঠে মেয়েটা প্রায় সোজা হয়ে বসতে যেতেই,মাথার প্রচণ্ড একটা শক্ত বা ড়ি খেয়ে, কঁকিয়ে উঠল সে। একটু একটু করে তার সব মনে পড়ছে। এই মুহূর্তে রয়েছে একটা বড় কাঠের বাক্সের ভেতরে। শেষ মুহূর্তের আলোয় সে দেখেছিল, জিনিসটা একটা সিন্দুকের মত। দেরী না করে এর ভিতরেই নিজেকে লুকিয়ে নিয়েছিল সে। সূর্যের আলোর অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরে কখন যে তার চোখ লেগে গিয়েছিল সে টের ই পায়নি। সেই প্রচণ্ড চিৎকার, ভয়ঙ্কর আ র্তনাদ এখনো তার কানে লেগে আছে। প্রাণপণে দুহাত দিয়ে কান চেপে রেখেও, সেই শব্দ আটকানো যায়নি।
বাইরে যেন পিন পতন নীরবতা। মেয়েটি ধীরে ধীরে বাক্সের গায়ে কান ঠেকিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। জলের ছলাৎ ছলাৎ আর হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই বাইরে। একটু আগেও যা ঘটছিল,তার সাক্ষী সে নিজে। হুট করেই এই মুহূর্তের এই নীরবতা যেন তাকে স্বস্তি দিতে পারছে না কিছুতেই। কিন্তু এভাবেই বা কতক্ষণ? আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে,বিপদ কেটে গিয়েছে। সে কী বাইরে বেরোবে? নাকি এখানেই অপেক্ষা করবে...
আরও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে, মেয়েটি ধীর হাতে বাক্সের ঢাকনাটা খুলতেই, একটা ঈষৎ শব্দ ছড়িয়ে পড়ল,ঘরের বাতাসে। একটা ঘর। প্রায় অন্ধকারই বলা চলে। ছোট্ট কাঠের জানালা গলে যেটুকু আলো বিছানায় এসে পড়েছে সেটুকু আলোয় কোনো কিছুই পরিষ্কার করে দেখা যায় না। তারপরেও মেয়েটি খুব ধীর পায়ে বেরিয়ে এলো বাক্সর ভেতর থেকে। কাঠের মেঝে জলে ভেজা। এই মুহূর্তে সে সেই বিশ্রী আঁশটে গন্ধটা পাচ্ছে না। তার মানে কী, সত্যি সত্যি জিনিসটা ফিরে গিয়েছে? কিন্তু বাকিরা কোথায়?কারোরই তো কোন শব্দ সে পাচ্ছে না। অন্ধকারের ভেতরে কোনরকমে হাতড়ে হাতড়ে সে বাইরে বেরিয়ে এলো। তবে অতি সাবধান সে। কোন রকমের শব্দ করা চলবে না।
অন্ধকারে পরিষ্কার ভাবে দেখা না গেলেও সে জানে, এই ঘরের থেকে বাইরে বেরলেই একটা সরু করিডোর। যার দুইদিকে সারিবদ্ধ ছোট ছোট কেবিন। মহামতি হাউসবোট নামে বোট হলেও আদপেই বড়সড় হাউসবোট। আজ বিকেলেও এই বোটটি মানুষের কোলাহলে মুখরিত হয়ে ছিল,কিন্তু এখন সেই বোটের কেবিনগুলোতে শ্মশানের নীরবতা। করিডোরের শেষ মাথায় একটা জানালা। সেই জানালা গলে চাঁদের ঈষৎ আলো কাঠের মেঝেতে এসে পড়েছে। করিডোরের শেষ মাথায় ওই জানালারই গা ঘেঁষে একটা সরু কাঠের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে একতলায়। এই ফ্লোরের ওপরেও আরেকটা ফ্লোর আছে। সেখানে যদিও কোন কেবিন নেই। মাথার ওপর একটা শক্ত

ছাউনি ছাড়া। পালাতে হবে,যে কোন ভাবেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে। হাউসবোটটির নীচের তলায় একটা ছোট ডিঙি দেখেছিল সে। সেটা কী এখনো অক্ষত আছে? যাচাই না করে জানবার উপায় নেই। তাকে নীচের তলায় যেতে হবে। একবার এই বোট থেকে বেরিয়ে সেই ডিঙিতে উঠে পড়তে পারলেই...

এসব ভাবতে ভাবতেই মেয়েটা যেই পা দুয়েক এগিয়েছে সাথে সাথে কিছু একটা পায়ের ধাক্কায়,ঝন ঝন করে উঠল। নীরব চরাচরের বুক চিরে এই ধাতব আওয়াজ বোটের চারপাশে ছড়িয়ে পড়তেই চাপা আতঙ্কে আঁতকে উঠল মেয়েটি। সর্বনাশ!বেঁচে থাকতে গেলে যে কোন আওয়াজ করা চলবে না তার। এখন কী হবে?

কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময়, আচমকা বাতাস ভারী করে তুলল একটা বিশ্রী আঁশটে গন্ধ। আবার,আবার ফিরে এসেছে সেই গন্ধটা। অর্থাৎ ফিরে এসেছে সে। মেয়েটি পড়িমড়ি করে ছুটল সামনের দিকে। যে করেই হোক,এই সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলাতে পৌছতেই হবে তাকে। কিন্তু আচমকাই কে যেন তার পা জোড়া টেনে মতামতী বোটের কাঠের মাঝেতে গেঁথে দিলো। করিডোরের শেষ মাথার জানালা গলে কাঠের মেঝের উপর, যে ঈষৎ আলোটা এসে পড়েছিল সেখানে আচমকাই উঠে দাঁড়িয়েছে একটা ছায়া মূর্তি। একটা লম্বা দীঘল ছায়া মূর্তি যার কাঁধের দুই পাশ থেকে নেমে আসা দুটো হাত ঝুলছিল হাঁটুর নীচে। চোখ নাক মুখ কিছুই দেখা যায় না কিন্তু এতো দূর থেকেও মেয়েটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই হাতের আঙুলের মাথায় জেগে থাকা তীক্ষ্ণ নখর গুলো। এই জিনিস, বুঝি এতক্ষণ এই অন্ধকারের ভেতরেই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল, সঠিক মুহূর্তের অপেক্ষায়। কী করবে এখন সে?

বাতাস আঁশটে গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে আগের তুলনায়। মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে আসছে। পালাবে?কিন্তু পালানোর পথ যে বন্ধ। তাহলে? ওদিকে ছায়াটা যে খুব ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে আসছে। নাহ,ধরা পড়া চলবে না। কী বলেছিল যেন, লোকটা…

“ধরা পড়া চইলবো না আপু। যাই করেন ধরা পইড়েন না। এর থিকা ভালা...“

ঠিক এমন সময় অন্ধকার ভেতর থেকে, বেরিয়ে এলো একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ। এই ধরনের শিসের শব্দ সে শুনেছে, লঞ্চ বা স্টিমার ছাড়ার সময়। আর ঠিক তারপরেই একটা বিশ্রী খিল খিলে হাসির শব্দ।

না। সে ধরা দেবে না এই ভয়ঙ্করী কে। মেয়েটি এক মুহূর্ত দেরী না করে পেছনঘুরে ছুট দিলো। করিডোরের উল্টোদিকে কেবিনের শেষ মাথায় উপরে যাওয়ার সিঁড়ি। ওইটা দিয়ে উপরে, কিন্তু তারপর?উঁহু, সে ভেবে নিয়েছে কী করতে হবে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠে এলো সে। উপরে এসেই, তীব্র ঠাণ্ডা বাতাসে তার শরীর কেঁপে উঠল যেন। কোন ভাবে আলগা হাতে,তিনতলায় ওঠার দরজাটা সে বন্ধ করে দৌড়ে বোটের একেবারে সামনে দিকে চলে এলো। মাথার ওপর চাঁদের আলো। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে,তাঁদের এই হাউসবোটটি ঘিরে রয়েছে এক দিগন্ত বিস্তৃত কুয়াশার চাদর ঢাকা জলরাশি। এটা তো কোন নদী নয়?তবে কী সমুদ্র? কিন্তু সমুদ্রের জল কী এত স্থির হয়?আলতো জোছনার আলো এই প্রকৃতিতে এক মায়ার ব্যূহ রচনা করেছে যেন। কিন্তু মেয়েটির সে এই দৃশ্য উপভোগ করবার সময় নেই। সে জানে এই দরজাটা আটকানোর কোন মানে হয় না। সেই ভয়ঙ্করীর কাছে এসব নস্যি। আচমকা তার চোখ জলে ভরে উঠল। কিছু প্রিয় মুখ তার চোখের সামনে এই মুহূর্তে ছবির মত ভেসে উঠছে... সে কখনওই

ভাবেনি, যে এই চেহারা গুলো সে আর কোনোদিন দেখতে পাবে না। কান্নার ঢেউ আচমকা গলার কাছে দলার মত করে আটকে এলো যেন। কিন্তু তার যে দুর্বল হওয়া চলবে না। এই ভয়ঙ্করীর হাতে একবার ধরা পড়লে, তার যে কোনোদিন আর মুক্তি হবে না।
পরনের শাড়িটাকে দ্রুত হাতে খুলে,সেই শাড়িটির এক প্রান্ত সে শ ক্ত হাতে বেঁধে দিলো রেলিংএর সঙ্গে। সে কী রেলিং বেয়ে নামার চেষ্টা করছে? কিন্তু তাই যদি হয়,তাহলে শাড়ির অন্যপ্রান্ত নীচের দিকে না ছুঁড়ে সা রা মুখে ভালো করে জ ড়িয়ে গলায় পেঁ চিয়ে নিচ্ছে কেন? তাহলে কী মেয়েটি...
মেয়েটি ধীরে ধীরে রেলিং এর ওপরে উঠে বসলো। গলার ভেতর থেকে একটা ফোঁপানির স্বর। সারা মুখ সে কাপড়ে এমনি এমনি ঢেকে রাখেনি। শেষ শ্বাস টুকু বেরোনোর আগে, নিজের মুখ সে কোনোভাবেই দেখাবে না ওই ভয়ঙ্করীকে। ভুল করেও যদি তার মৃ তপ্রায় চোখে সেই ভয়ঙ্করীর ছায়া একবার পড়ে যায় তাহলে, সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওদিকে হু হু করে হাওয়া বইছে, বোটের তলে জলের ধাক্কা লেগে ছলাৎ ছলাৎ শব্দটা মাত্রারিক্ত বেড়ে উঠেছে। মেয়েটি রেলিং টপকে উল্টোদিকের সরু পা দানি তে কোন মতে উঠে দাঁড়ালো। শরীরটা রেলিংএ ঠেস দেওয়া। একটু এদিক ওদিক, আর সোজা ওপর তি নতলা থেকে নী চে।
ঠিক এমন সময় পেছন থেকে আবার সেই তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ আর তারপরেই দড়াম করে খুলে গেল সিঁড়ির দরজাটা। পাতলা কাপড়ের আড়াল থেকে মেয়েটি ভয়ার্ত চোখে দেখল, তিনতলার দরজাটা কাছে,দাঁড়িয়ে রয়েছে রাত্রির অন্ধকারের থেকেও অন্ধকার একটা কালো ছায়া। সম্ভবত মেয়েটিকে,ওইভাবে রেলিংএর উল্টোদিকে ওই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই একটা সুতীব্র গর্জন বেরিয়ে এলো অন্ধকার ছায়ার গলার ভেতর থেকে। একটা কালো ছায়া দুহাত বাড়িয়ে ভয়ঙ্কর গতিতে প্রায় ভেসে এলো মেয়েটির দিকে। কিন্তু মেয়েটি আর ভয় পাচ্ছে না। সেই চিৎকার করে উঠল, সেই ছায়া মূর্তির দিকে ঘুরে।
“পাবি না। তুই আমায় পাবি না। কিছুতেই না...“
সাথে সাথে আবার সেই ভয়ানক গর্জন। কেঁপে উঠল, পুরো মহামতি ফেরি।
মুহূর্ত মাত্র সময়। মেয়েটির শরীর খসে পড়ল, রেলিং এর ধার ঘেঁষে। ধপ করে একটা ভারি শব্দ। আর তারপরেই কাপড়ের একটা মচমচ শব্দ।
অন্ধকার হাউসবোটের একতলার সামনের দিকটা কিছুটা জায়গা ফাঁকা। এখানে সাধারণত যাত্রীরা বসে সামনের ভিউ উপভোগ করে থাকেন। মেঝে থেকে খানিকটা উপরে এই মুহূর্তে সেইখানে হাওয়ায় মেয়েটার শরীর দুলছে। এত উঁচু থেকে গলায় কাপড় বেঁধে ঝুলে পড়ায় মুহূর্তেই ঘাড় ভে ঙে স্পাইনাল কর্ড থেকে করোটি আ লাদা হয়েছে সেইক্ষণেই। মৃ ত্যুও হয়েছে মুহূর্তেই। কিন্তু ওটা কী? সেই ছায়া কুণ্ডলী ধোঁয়ার আকারে,সেই কাপড় বেয়ে, নীচে নেমে এলো যেন। তারপর,মৃত মেয়েটার শরীরটাকে এমনভাবে পেঁচিয়ে ধরল যেন, পেছন থেকে একটা কালো শরীর মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরেছে। অজানা উৎস থেকে সেই তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ তীব্র স্বরে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। তারপর,আচমকা, সেই শরীরটা মেয়েটির কানের কাছে মাথা বাড়িয়ে সাপের মত হিসহিসে স্বরে বলে উঠল,
“হাওরের...হাওয়া হাওরের...পানি...
আলাকুতি বিবি হাওরের রানি...”

পরক্ষনেই কোথা থেকে যেন এক ভয়ঙ্কর ধোঁয়াশা এসে ঘিরে ধরল, পুরো জায়গাটিকে। আর সেই ধোঁয়াশার ফাঁক গলে দেখা গেল, শান্ত জলের তলে,একটু একটু করে, ডুবে যাচ্ছে,মহামতি হাউসবোটটি, যা আজ সকাল বেলা ছেড়েছিল, সুনামগঞ্জ উপজেলার সদরঘাট থেকে।

২) ময়নামুখী হাউসবোটঃ

“হবে না? মানে?” কথাটা বলতে বলতেই শতিভু চরম বিরক্তিতে সিগারেটটা মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে দিলো। তার সামনে এই মুহূর্তে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রতিভাস। চোখে মুখে তারও বিরক্তি। মাথার ওপর কালো মেঘের ঘনঘটায় চারিদিক এই বিকেলের মধ্যেই কেমন যেন অন্ধকার করে এসেছে। ঝড় নামবে নাকি?কই? ওয়েদার ফোরকাস্ট তো তেমন কিছু দেখাচ্ছে না।
“ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললাম, যে হাউসবোটটা আমাদের জন্য বুক করা ছিল এজেন্সির মারফত সেই বোট তাঁদের বুকিং ক্যান্সেল করেছে।“
“হোয়াদ্যা...” মুখ থেকে একটা বিশ্রী গালাগাল বেরিয়ে এলো শতিভুর। “এরকম আবার হয় নাকি? মজা পেয়েছে, বুকিং ক্যান্সেল করে দিলেই হল? এই... এই ম্যানেজার। এইদিকে এসো...” কিছু দূরে একটা বেঁটে খাটো চেহারার, বছর পঁয়ত্রিশের লোক, দুজন সুন্দরী মহিলার সঙ্গে কিছু আলোচনা করছিলেন। শতিভুর উত্তপ্ত কণ্ঠ শুনে, খানিকটা কাচুমাচু মুখে, ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। এরই মধ্যে কখন জানি, ঝুমুর আর রঙ্গন কিছু একটা গড়বড়ের আশঙ্কা করে, ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো।
“কী কেস? কী শুনছি এসব?”
“জ্বী সার! একচুয়ালি এখানে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হইসে, যেটা আমরা আগে থেকে জানতে পারি নাই। আপনারা আমাদের ট্রাভেল পলিসি গুলো খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন, উই আর ভেরি নিউ টু দিস লোকেশন। বাট এখানে একটা নিয়ম আসে স্যর। পার্টিকুলার আজকের দিনে এখানে একটা রিচুয়াল ফলো করা হয়। আজকের রাতে, হাওরে থাকা নিষেধ। এখানকার কেউই হাওরের পানিতে আজকের রাতে তাঁদের হাউসবোট নামায় না। এটা এখানকার রুলস।“
“রুলস?আপনারা জানতেন না এখানকার এমন রুলস?”
“ওই যে বললাম সার! উই আর নিউ টু দিস এরিয়া।“
এবার ওনার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা টাক মাথাওয়ালা এদেশীয় খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন,“কিন্তু যেই হাউসবোট আমাদের বুকিং নিয়েছিল, তাঁরা তো বুকিং নেওয়ার সময় আপনাদের অ্যালার্ট করতে পারতো। হোয়াই দে ডিড দ্যাট?”
“আমরা ওদের সঙ্গে কথা বলসি। আসলে, এগুলা সবই লোকাল লোকজন ম্যানিপিউলেট করে। আমরা আপনাদের জন্য যে হাউসবোটটা ঠিক করেছিলাম, ওটা একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বোট ছিল। ইউ অল ক্যান ট্রাস্ট আস, সার। আসলেই,অনেক টাকার অফার দেখে, হাউসবোটের ওনার অফারটা ফেলতে পারে নাই। ভাবসিল,কোনভাবে সে ম্যানেজ করে নিবে। বাট এখন, বাকিরা ঝামেলা করতেসে। তাঁরা ওকে কিছুতেই বোট নামাইতে দিবে না। ওরা বলতেসে যা হবে কালকে। আজ কোন বোট এমনকী কোনো ডিঙিও নাকি হাওরে থাকবে না।“
“কাল?মজা পেয়েছেন নাকি?” শতিভুর কণ্ঠটা আরেকটু উঁচুতে উঠতেই,এতক্ষণ যারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁরাও প্রায় কাছাকাছি চলে এলো। এর মধ্যে যেমন,তাঁদের সহযাত্রীরা রয়েছেন, তেমন রয়েছেন,স্থানীয় অন্যান্য বোটের মালিক ও মাঝি রা। ওরা এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে

রয়েছেন, সেই জায়গাটি বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ উপজেলার সদরঘাট। এখান থেকেই মূলত, বাংলাদেশের অন্যতম টুরিস্ট আকর্ষণ,হাওরে যাওয়ার বোট, ডিঙি, নৌকা,হাউসবোট ভাড়ায় পাওয়া যায়। ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি নৌকা, বোট, হাউসবোট গুলি এই মুহূর্তে, স্থির, নির্জীবের মত দাঁড়িয়ে। এই ভরা সিজিনে, এই সময় অন্যদিন হলে, মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা দায় হত সকলের। সম্ভবত, এই নিয়মের জন্যই এলাকার লোকজন ছাড়া বাইরের তেমন কেউ নেই।
“কাল মানে, কাল সারাদিন সারারাত নিয়ে পরশু বিকেলে আমাদের ট্যুর শেষ হবে। সম্ভব নয়। ঢাকা থেকে আমাদের পরশু রাতেই আমাদের কলকাতা ফেরার ফ্লাইট। আমরা কিছুই শুনতে চাই না। আপনি আজকেই ব্যবস্থা করুন।“
“একদম ঠিক বলসেন ভাইয়া।“ সেই দুটি সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে একজন চিন্তান্বিত স্বরে বলে উঠল, “পরশু আমাদের একটা ইভেন্ট আসে। পরশু কোনোভাবেই সম্ভব নয়।“
“কিন্তু ম্যাম! আমরা ওদের কনভিন্স করবার চেষ্টা করতেসি। বাট দে আর নট অ্যালাউ টু হিয়ার আস।“
“সেটা আমাদের কনসার্ন নয়।“ এতক্ষণ পরে প্রতিভাস চোয়াল শক্ত করে, মুখ খুললো,“ট্যুর শুরু করবার আগে, আপনি আর আপনাদের কোম্পানি আমাদের অনেক বড় বড় বাতেলা দিয়েছেন। বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান টুরিস্ট এজেন্সি,চার বছর ধরে আপনাদের কোম্পানি নাকি অ্যাওয়ার্ড উইন করছেন হেন তেন আরও কত কী। অথচ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এত খারাপ? শুধু আমরা নয়,প্রায় বারোজন মানুষকে, পূর্ণিমার রাত্রে হাওরের এ প্লাস সার্ভিস প্রোভাইড করবেন বলে, এতোদূর টেনে এনে এখন বলছেন, আজ হবে না,কারণ এখানকার কিছু অদ্ভুত রিচুয়াল আছে? আর ইউ কিডিং মি?ভুলে যাননি বোধয়, এই সার্ভিস প্রোভাইড করবার জন্য,আপানরা একটা মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছেন। আপনারা প্রতিশ্রুতি মতে, পরিষেবা দিতে বাধ্য।“
ভদ্রলোকের নাম রিজওয়ান সিদ্দিকি পার্থ। সকলের উত্তপ্ত বাদানুবাদের মধ্যে পড়ে বেশ একটা কাঁচুমাচু অবস্থা।
“আমি এজেন্সির সঙ্গে কথা বলবো। আপনাদের টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া...”
কথাটা শেষ করবার আগেই, পাশ থেকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে উঠলেন,“আর টাইম। সেটা কিভাবে ফেরত দিবেন? দেখুন, যদি টাকার সমস্যা হয় তাহলে আমাদের জানাইতে পারেন...আমরা সকলে মিলে আরো নইলে কিছুটা...”
“সমস্যা ট্যাখা লইয়া না। ইকানো,এমন কিস্সু আসে, যা খওয়া যাইত না।“ ভিড়ের মধ্যে থেকেই স্থানীয়দেরই একজন বিড়বিড় করে কথাটা বলে উঠতেই, সকলেই তার মুখের পানে তাকালো। সাদা পাঞ্জাবী, পরনে লুঙ্গী,গালে কাঁচাপাকা বড় দাড়ির আস্তরণ। মুখের ভেতরে পান চেবানোর ফলে, ঠোঁটের দুই কষ লাল হয়ে রয়েছে। এলাকার মুরুব্বি মানুষদের মত। তিনি সকলের মুখের পানে একবার তাকিয়ে বললেন,“আদাব, আমার নাম মনসুর সর্দার। একটা কথা বইলেন। ভরা সিজিনে,এমন একটা দিন আইলে, মাঝি মোল্লা,নৌকার মালিকদের কত ট্যাখা ক্ষতি বুইঝেন না? তারপরও হেতির কেউই,হাওরে পা ডোবাই না। ক্যা?কারন আছে।“
“কী কারণ?”

রঙ্গনের প্রশ্নের উত্তরে, মনসুর মিয়াঁ,কয়েক মুহূর্ত থেমে, বিড়বিড় করে বলে উঠেন। "কওন যাইব না। শুধু এইটুক জাইনা রাইখেন, চেনা হাওর অচেনা হয় আজকের রাতে। আর..." কথাটা বলতে গিয়েই আচমকা কেমন যেন ঢোঁক গিলে নেন সেই মুরুব্বি।
"আর কী?"
"কিছু না। আপনারা নিষেধ হোনেন। কাল সকালে হাওরে যাইয়েন। আইজরাতে,এইহানের কুনো হোটেলে উইঠেন, বজরাতেও থাইকেন। কিন্তু ঘাটে থাইকেন। হাওরে লয়। আইজরাতে,কুনো বোট হাওরে থাহে না। সে আইপ্নারা যতই ট্যাকা দ্যান না ক্যা।"
একজন স্যুট বুট পরা ভদ্রলোক, এতক্ষণ, এই জটলার মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপ করে, আচমকা তিনি নীরবতা ভেঙ্গে বলে উঠলেন,
"আমাদের কথা হয়েছিল ষাট হাজারে। আমরা এখন অ্যামাউন্ট টা ডাবল করছি। এক লাখ,বিশ হাজার। এরপর?এক রাতের জন্য একলাখ বিশ হাজার। এরপরও কেউই রাজী হবেন না?"
ভদ্রলোকের এই কথায় ঘাটে গুঞ্জন উঠল। একলাখ বিশ হাজার! টাকার পরিমাণটা অনেক,সেটাও আবার একরাতের জন্য। যারা যারা ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের প্রত্যকের চোখে মুখেই, এক ধরনের অপ্রত্যাশিত লোভে চকচক করে উঠল। সকলেই নিচু স্বরে কথা বলছে। কিন্তু আচমকা তাঁদের কথা ছাপিয়ে সেই আগের ভদ্রলোক, গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন,
"আপনারে,কিইসি তো... কেউ যাবে নানে...। আইজকের রাইতে..."
"এক লাখ তিরিশ!" ভদ্রোলোকের কথা ছাপিয়ে সেই লোকটি আবার দাম হাঁকালো। ঠিক যেন নিলাম চলছে। "যে প্রথম যাওয়ার জন্য হাত তুলবে, এই টাকা সেই পাবে।"
"মজা করেন মিয়াঁ? আপনাদের ভালোর জন্যই..."
"একলাখ চল্লিশ!"
"হুনেন আপনি," মুরুব্বি লোকটি,রাগে, দাঁতে দাঁত চিপে বলে উঠল,"এই ঘাটের কুনো মাঝি, এই নিয়ম না মানলে,তারে ঘাঁট থেকে বহিষ্কার করা হইব...কুনো হালায় তারে..."
"দেড়লাখ..."
ঘাটের গুঞ্জন চরমে উঠল।
" এখানকার কেউ হাওরের নিয়ম ভেঙ্গে নিজেকে বিক্রি করে না,সে আপনে, দুই লাখ..."
"আমি রাজী!" আচমকা ভিড়ের মধ্য থেকে, একটা জলদগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসতেই, সকলে অবাক হয়ে দেখল,বোট মালিক আর মাঝিদের ভিড়ের মাঝে এক বছর চল্লিশের লোক হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ঘামে ভেজা,হাফ হাতা জামার আড়ালে থাকা পেটানো শ্যামলা শরীর আর পাথরের মত কঠিন অভিব্যক্তিহীন মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, জীবন যুদ্ধে,এই ভদ্রলোক, কমদিনের খেলোয়াড় নন।
"মাসুদ!"
সকলের চোখের দৃষ্টি মাসুদ নামে ভদ্রলোকটির দিকে নিবন্ধ। তারই গা ঘেঁষে একটি বছর চোদ্দ পনেরোর ছেলে দাঁড়িয়ে। গোলগাল চেহারা, চাঁদপানা মুখে দুটো ডাগর ডাগর চোখ। আর নাকের উপরে হালকা গোঁফের রেখায়, তার পানে তাকালে মায়া হয় একটা।
সেই লোক, মনসুর মিয়াঁ দিকে,একটু ঘাড়টা ঝুঁকিয়ে, খানিকটা টিপ্পনীর সুরে বলে উঠলেন,

“টাকার কাছে সবাই বিক্রি হয়। বুঝেলন জানাব?“ কথাটা বলেই একটা উপহাসের হাসি হেসে লোকটা সরে আসতেই শতিভু এগিয়ে গেল সেই স্যুট বুট পরা ভদ্রলোকের দিকে। ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে তাঁরা।
“ দেড় লাখ টাকা একরাতের জন্য? কে দেবে এত টাকা ?আমাদের বাজেট কিন্তু এত নয়। আপনি একবার আলোচনা...”
শতিভুর কথা মাঝপথেই থামিয়ে, লোকটি হাত তুলে বলল,“তোমাদের থেকে টাকা চেয়েছি আমি? তোমাদের সাথে যেই টাকায় রফা হয়েছে, সেই টাকাই তোমরা পে করো। বাকীটা আমিই...”
“এতোগুলো টাকা, আপনিই বা অকারণে কেন দেবেন...”
“ অকারণ কোথায়?” কথাটা বলেই,লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে একবার মনসুর সর্দারের দিকে তাকালো, “গরীব মানুষের এত তেজ দেখতে ভাল্লাগে না। ওদের এই মিথ্যা আত্মসম্মানের মে রুদণ্ডটা গুঁ ড়ো করবার মজাই আলাদা।“
ওদিকে ততক্ষণে সর্দার প্রায় রাগে অন্ধ হয়ে ছুটে এলেন মাসুদ নামের সেই ভদ্রলোকের কাছে,“এ তুই কী বলসস? এহুনি কথা ফিরিয়ে নে মাসুদ... আজ হাওরে যাইতে নাই, তুই জানোস না?“ বাকী সকলের মধ্যে থেকেও উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে আসতে লাগলো। সেই উত্তেজনা যে অজানা আতঙ্কের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করার কারণে না যতটা,তার থেকেও বেশি সম্ভবত, মাসুদের এতোগুলো টাকা লাভের পরিকল্পনায়।
মাসুদ সেই সকল কিছু অগ্রাহ্য করে, শান্ত স্বরে বলে উঠল,“তুমি আমার অবস্থাটা জানো আগেই। আমার ট্যাহাটা দরকার চাচা। আমার বিপদে,আমায় তোমাগো এই নিয়ম বাঁচাইতে পারবো না। বাঁচাইলে বাঁচাইব ওই ট্যাহাটা। আমায় যাইতেই হইব।“
মনসুর সর্দার, দুইহাতে তার বাহু চেপে ধরল,“তুই কী পাগল হইসস? কী কস তুই?হাওরে আইজকে যাইতে নাই, সে তুই ভালো কইরা জানোস। সে যদি জেগে উঠে,তরে নিজের দিকে টানে... না না। তুই যাবি না। তুই যাবি না মাসুদ।“
এমন সময়, এজেন্সির ম্যানেজার,রিজওয়ান সাহেব হেঁকে উঠলেন, “মাঝি কোন বোট তোমার? মাসুদ হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলো, “ওইদিকে যাইয়েন। আমি লোক পাঠাসসি। দেইখেন,লিখা থাকবো, ময়নামুখী হাউসবোট।” তারপরেই সে আবার ফিরল, মুরুব্বির দিকে।
“আমি নিয়ম জানি চাচা। যদি সে জেগেও ওঠে, বিশ্বাস কইরেন,তারে এড়ানো আমার পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু যাইতে আমায় হইবই।“ কথাটা বলেই মাসুদ,পাশের সেই অল্পবয়সী ছোকরার দিকে তাকালো, “রিপন,যা সোনা। ময়নামুখীতে ওদের লইয়া যা।“
“চাচা তুমি সত্যই যাবা? ওরা যে নিষেধ করে...” রিপনের কথায়,মাসুদের মুখে একটা ম্লান হাসি দেখা দিলো, “না গিয়া তো উপায় নাই বাপ। কথা দিয়া ফেলসি। খেলাপ করমু ক্যামনে? তুই যা...”
মনসুর মিয়ার চোখে জল, কোন ভাবে,মাসুদের হাত চেপে বলে উঠল, “আমি তোর বাপের বয়সী মাসুদ। আমার কথাটা হোন,সে কাউরে ছাড়ে নাই। সবাইরে গিল্যা খাইশে। এতোগুলা লোক, তাঁদের জীবন...। তর কিছু হইলে,মাইয়াডার কী হবে ভাবসস?”

মাসুদ হাত ছাড়িয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল, "ওর লিগ্যাই তো এসব করা। আর বিশ্বাস রাইখেন, আমি পারুম। কিন্তু আমারে আটকাইয়েন না। আপনার কথা আমি রাখতে পারুম না।"
কথাটা বলতে বলতেই যেই মাসুদ নিজের বোটের দিকে এগিয়ে যাবে, ঠিক তখনই,মনসুর সর্দার পেছন থেকে চিৎকার করে উঠলেন, "ঘাটের নিয়ম ভাঙলে শাস্তিটার কথা ভাবসস? এই ঘাটে তোর ময়নামুখী কোনদিনও দাঁড়াইব না আর। সেটা মাথায় থাহে যেন..."
"পরের কথা পরে ভাবুম চাচা। আগে এহন বাঁচি।" কথাটা বলেই মাসুদ দ্রুত পায়ে, ঘাটের দক্ষিণ দিকে রওনা দিলো। এই মুহূর্তে তার অনেক কাজ। ময়নামুখীকে রেডি করা। রাতের,দিনের রান্নার জন্য, সবকিছু মজুত করা। দলটা তো আর কম ছোট নয়। তবে সবার আগে,তার টাকাটার হিসেব বুঝে নিতে হবে। এই টাকাই যে তার হাতের পায়ের বড় বাঁধন। মনসুর চাচারে সে অনেক শ্রদ্ধা করে। অনেক বিপদে আপদে পাশে পেয়েছে সে তাকে। অথচ আজ, সেই লোকেরই বিপক্ষে গিয়ে,হাওরের উদ্দশ্যে রওনা দিচ্ছে সে। সে পাপ করল কী? করলেও এই পাপের খণ্ডন হবে কী?
ওদিকে,মনসুর সর্দার, ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কেবল।
পাশের থেকে একজন বিড়বিড় করে বলে উঠল, "এইবার?এইবার কী হইব চাচা?"
"হইব,ময়না মুখীর সর্বনাশ।" মনসুর সর্দারের চোয়াল শক্ত। "আর সেই সঙ্গে,ওই বোটে থাকা সকলের। দেখে লও। শেষবারের মত ওদের দেখে লও। কারণ,ওরা আর ফিরতে পারব না। সব কটা ম রবে। আইজকের রাতে সে কাউরে ছাড়ে না। শুধু তার জেগে ওঠার অপেক্ষা।"
কমবয়সী একটা ছেলে কৌতূহলী হয়ে বলল, "আর সে জাগে কীসে?"
"সে জাগে, মানুষের গন্ধে।"
******
"আপনাদের,কিছু কথা জানাইয়ে বোট ছাড়বো আমি..." সকল যাত্রীদের মাসুদ, হাউসবোটের ছাদে ডেকেছে লাস্ট মিনিট মিটিঙের জন্য। সকলের চোখজোড়া এই মুহূর্তে মাসুদের ওপর নিবন্ধ। আকাশটা হুট করেই,কেমন যেন আরো অন্ধকার করে এসেছে। আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস কী? ওদের ঠিক পিছনই, নীচের দিকে,ঘাটটা এইমুহূর্তে ভিড়ে থিক থিক করছে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলেছে না। মাসুদ জানে, ঘাটে দাঁড়ানো এতোগুলো মানুষের চোখ জোড়া এই মুহূর্তে ময়নামুখীর উপরেই নিবন্ধ
" এক, যতক্ষণ আপনারা এই বোটে আছেন, এখানে আমার কথাই শেষ কথা। আমি যা বলবো,তাই আপনাদের শোনা লাগবো। যা নিষেধ করবো তা করবেন না। হাওর দেখতে জানতে সুন্দর তখনই , যখন আপনারা হাওরের সৌন্দর্যকে সম্মান করবেন। দুই,এইসব ঝামেলায় পড়ে, যে সময়ে আমাদের হাউসবোট ছাড়া উচিত ছিল,তারও ঘণ্টা দুই পরে আমরা বোট ছাড়তেসি। এটা উচিত নয়। এখান থেকে হাওরের কাছাকাছি পৌঁছতেই নদীপথে আমাদের,তিনঘণ্টা লাগবে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, রিপন দেখবে। কোন প্রয়োজন হলে,ওরে জানাইয়েন। আর তিন নম্বর হইল, সকলেই দোয়া কইরেন যাতে আজকের রাতের ট্রিপটা সুন্দর হয়। আলহামদুলিল্লাহ!"
কথাটা বলেই, মাসুদ আর দেরী না করে,ঝট করে, ইঞ্জিন ঘরে নেমে এসে,চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিনটা স্টার্ট করতেই, ভট ভট করে একটা যান্ত্রিক শব্দ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। ময়নামুখী সদরঘাট ছাড়ছে। ছাদের উপরে দাঁড়ানো ময়নামুখীর যাত্রীরা, মহানন্দে,উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু মাসুদের চোখ ইঞ্জিনঘরের কাঁচের জানালা ছাপিয়ে,ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা, জনগণের ভেতরে কাউকে যেন

খুঁজছে। নাহ,সেই পরিচিত মুখকে সে দেখতে পাচ্ছে না। একটু একটু করে, ঘাটটা দূরে সরে যাচ্ছে তার থেকে। কিন্তু সেই চির চেনা মুখের হদিস নেই।
ঠিক এমন সময়, একটা চিৎকারে ঘোর ভাঙল মাসুদের। সে দেখল,মনসুর মিয়া, ঘাটের ধার বরাবর ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছে,
“মাসুদরে!গন্ধ পাইলেই নাক ঢাকিস। নাকটা শক্ত কইরা ঢাকিস। মনে থাকবে?আর সে এলে শব্দ যেন না হয়। কিছুতেই যেন শব্দ না হয়...”
মাসুদ বাকী শব্দগুলো শুনতে পেল না আর। সে দেখল, ঘাটের ধারেই মনসুর মিয়া হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়েছেন। আর হাত নাড়িয়ে কী একটা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বোঝানোর। কিন্তু মাসুদ ততক্ষণে,সেই না বলা কথা গুলো বোঝার সীমানা ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছে।

পর্ব দুই

১) হাওরঃ

ময়নামুখী হাওর এলাকার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হাউসবোট গুলোর মধ্যে পড়ে না। জন প্রতি এতজনের জন্য আলাদা কেবিনের ব্যবস্থাও নেই। তাই মোটামুটি সিচুয়েশন কন্ট্রোল করতে, আরোহীদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে থাকতে হচ্ছে। শতিভুদের যেই গ্রুপ টি, কলকাতা থেকে দিন কুড়ির জন্য বাংলাদেশ ট্রিপে এসেছে। এই ট্রিপেরই লাস্ট ডেসটিনেশন ছিল, এই হাওর পরিদর্শন। হাওর মূলত বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা, অনেকটা গামলা আকৃতির জলাভূমি। বন্যার জল ঢুকে, অথবা মৌসুমি বৃষ্টির সময় জায়গাটা জলপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন পুরো এলাকাটি একটি সমুদ্রের মত মনে হয়। চারিদিক থেকে আবদ্ধ থাকায়, বছরের সাতমাসই হাওর জলের তলায় অবস্থান করে। এই সময়, স্থানীয়দের যাতায়াতের মূল কাণ্ডারি হয়, ছোট ছোট ডিঙি গুলো। হাওরের জল কোন কোন জায়গায় এক কোমর হলেও, কোন কোন জায়গায় জলের গভীরতা কয়েক মানুষ পর্যন্ত হতে পারে।
দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন হাওর বাংলাদেশের বুকে অবস্থান করলেও, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে হাওর একটি আকর্ষণীয় পর্যটন শিল্পের রূপ নিয়েছে। ছোট ছোট নৌকা, যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে বড় মাঝারি মানের হাউসবোট। এখন তো আবার প্যাকেজ সিস্টেম হয়ে গিয়েছে। যাত্রী নিয়ে তাঁরা পাড়ি দেয় হাওরের বুকে। দিগন্ত বিস্তৃত জল থই থই হাওরের জলে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা এক কথায় অবর্ণনীয়। আর তা যদি হয়, কোন পূর্ণিমার রাত্রি তাহলে তো কথাই নেই।
ময়নামুখী তিনতলা বিশিষ্ট একটি কাঠের হাউসবোট। যার দো তলায় একটা সরু করিডোরের উভয়পাশে মুখোমুখি দুটো দুটো চারটে কেবিন। আর উপরের তলায় মুখোমুখি আরো দুটো। তিনতলায় কেবিনের সামনেটা বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে রেলিং ঘেরা খোলা ছাদ। পূর্ণিমার রাতে হাওরের শোভা মূলত এখান থেকেই দেখে পর্যটকরা। একতলটা মূলত ইঞ্জিনরুম, স্টোররুম, রান্নাঘর, একটা ছোট রুম আর একটা বড় খাওয়ার জায়গা নিয়ে তৈরী। মাসুদ আর রিপন দুজনেই স্টোররুমেই ঘুমোয়। ময়নামুখীর তিনটি ফ্লোরে চারটি বাথরুম আছে। একতলায় একটি, দুতলায় দুটি আর উপরের তলায় একটি। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে, নীচ থেকে ওপর তলা পর্যন্ত ওঠা যায়। মাসুদ চেষ্টা করেছে, নিজের সীমিত সাধ্যের মধ্যে, ময়নামুখীকে সাজিয়ে তোলার।
শতিভুদের কেবিনটা দোতলায়। দুজনের মাপে একটা বিছানা ছাড়াও, সামনে একফালি জায়গা রয়েছে। এই মুহূর্তে এই কেবিনের মধ্যে, ওদের দলের পাঁচজন রয়েছে। শতিভু, প্রতিভাস, সায়নী বিছানার উপরে আর রঙ্গন, ঝুমুর সেই একফালি জায়গায় দুটো চেয়ার পেতে বসে রয়েছে । এদের মধ্যে, শতিভু, প্রতিভাস কলেজ ফ্রেন্ড। আর রঙ্গন প্রতিভাসের মাসতুতো ভাই। ঝুমুর আবার রঙ্গনের অফিস কলিগ হলেও এদের এই গ্রুপের সঙ্গে ওর ভালোই ওঠাবসা। কান পাতলে অবশ্য এও শোনা যায়, যে ঝুমুরের নাকি প্রতিভাসের প্রতি একটা সফট ফিলিংস রয়েছে। আর রইল বাকি সায়নী। সে হল, শতিভুর প্রেমিকা কাম বাগদত্তা। সামনের ডিসেম্বরেই ওদের বিয়ে।

“তোরা ফ্রেস হয়েছিস?” শতিভু কেবিনের ছোট্ট কাঠের জানালা দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়াটা উড়িয়ে বাকীদের দিকে প্রশ্ন করতেই, দরজায় একটা ঠকঠক শব্দ। রঙ্গন, সকলের মুখপানে তাকিয়ে দরজাটা খুলতেই দেখা গেল, দরজায় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে রিপন নামের সেই কেয়ারটেকার ছোকরাটা।
“কী হয়েছে?”
“সন্ধ্যার নাস্তা দেওয়া হইসে। নীচে আসেন।“
“এখানেই দিয়ে যাও। আবার সেই নীচে যেতে হবে? ভাল্লাগে না!” সায়নী খানিকটা ন্যকাস্বরে কথাটা বলেই, শতিভুর কোল ঘেঁষে বসতেই রিপন মাথাটা নাড়াল, “খাবার উপরে আনার নিয়ম নাই। আপনারা নীচের হলঘরে আসেন। চাচায় কিসু কথাও কইবো।“ কথাটা বলেই মুহূর্ত মাত্র দেরী না করে, ছেলেটি পাশের কেবিনে টোকা মারলো। রঙ্গন দেখল, উল্টোদিকের কেবিন থেকে সেই দুজন সুন্দরী মহিলা বেরিয়ে এসেছে।
“ভাইয়া, হাওর আর কত দূর? আমরা আইসা পড়সি কী?”
রঙ্গন কাঁধ নাড়িয়ে জানালো, তার কোন ধারনা নেই। পাশের রুমটি থেকে বেরিয়ে এসেছেন, একজন ভদ্রলোক। বয়স, পঞ্চাশ থেক পঞ্চান্ন। কিন্তু চেহারা দেখলে মনে হবে চল্লিশের আশেপাশে। আজ একটি কেবিনে শতিভু প্রতিভাস, আরেকটি কেবিনে, ঝুমুর আর সায়নীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এই দলে বাকি রইল রঙ্গন এই ভদ্রলোক যেহেতু একা তাই রঙ্গনকে রাত টুকুর জন্য রুম শেয়ার করতে হবে এই লোকের সঙ্গে। অবশ্য লোকটির সঙ্গে কথা বলে রঙ্গনের যে খুব একটা ভালো লেগেছে তা নয়। কিছু মানুষ আছেন যারা অহেতুক গম্ভীর হয়ে থাকেন সব সময়। এই ভদ্রলোকও তেমনই। ভদ্রলোকের নাম, ইরফান হাসান বন্ধন। থাকেন রাজশাহীতে। একলাই থাকেন। বিয়ে করেননি। কিন্তু কাজটা ঠিক কী করেন জানা যায়নি।
রঙ্গন বাকীদের সাথে যখন, নীচের তলার হলঘরে এসে উপস্থিত হল, তখন ওই বন্ধন সাহেব ছাড়া, বাকী সকলেই মোটামুটি উপস্থিত হয়েছে একতলায়। দুতলায়, ওরা আটজন ছাড়াও তিনতলায়, দুটো পরিবার রয়েছে। একজন সেই স্যুট পরা সেই অহংকারী ভদ্রলোক, যার জন্য আজকের এই ট্রিপটা হচ্ছে। তিনি, একপাশের টেবিলে বসে, একমনে ফোনে কী ঘেঁটে চলেছেন। তারপাশেই বসে রয়েছেন, স্বল্প বয়সী এক অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা। লোকটির নাম মোমম্মদ মহাসীন আলম। ঢাকা কলকাতা জুড়ে তার বিরাট বড় রিয়েল এস্টেট এর ব্যবসা। মূল বাসিন্দা বাংলাদেশের হলেও, বছরের বেশির ভাগ সময় তাকে কলকাতা সহ ভারতের নানান প্রান্তে কাটাতে হয়। বয়সের অনুপাতে মহিলাটি এতই ছোট যে ওরা সকলে, এই মহিলাকে তার মেয়ে ভেবেছিল সকলে। পরে জেনেছে, এই মহিলা নাকি ভদ্রলোকের তৃতীয় স্ত্রী।
রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা সুস্বাদু তেলেভাজার গন্ধে, ওদের পেটের ভিতরটা কেমন কী জানি, খিদেয় মোচড় দিয়ে উঠল।
উপরের তলায়, আরেকটি পরিবার রয়েছে। আরেকজন টাক মাথাওয়ালা ভদ্রলোক ছিলেন, যাকে দেখা গিয়েছিল ভিড়ের মধ্যে। একজন হিন্দু মহিলা আর একটা বছর ছয়েকের দুরন্ত বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছে ওনার সাথে। শতিভুরা সব কয়টি চেয়ারে ভাগাভাগি করে বসলো। একতলাটা মোটামুটি ফাঁকা। অন্ধকার ঘনিয়েছে ইতিমধ্যেই, মেঘ করেছে নাকি? চাঁদ দেখা যাচ্ছে না তো? নদীর হু হু করে ছুটে আসা ঠাণ্ডা হাওয়ায়, মহিলাদের পোশাক সামলানোই মুশকিল। ওরা সকলে এসে

বসতেই, রিপন নামের ছেলেটি, প্রত্যেককে চা আর জল খাবার দিয়ে গেল। ট্যুর এজেন্সির ম্যানেজার রিজওয়ান বাবু কে দেখা গেল না কোথাও। ওঠেন নি নাকি বোটে?
সকলেই যে যার মত পরিচিতি দিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। ওই যে দুজন সুন্দরী মহিলার কথা বলেছিলাম তাঁরা, সম্পর্কে কাজিন হন একে অপরের। দুজনে মিলে হাওরের ট্যুরে বেরিয়েছে। একজনের নাম, তাঞ্জিয়া ঈষিকা আরেকজনের নাম জান্নাতুল সিদ্দিকি বীথি। থাকেন ঢাকারই ধানমণ্ডি এলাকায়। বাংলাদেশের মত জায়গায় থেকে, দুটো মেয়ে একলা একলা বেরিয়ে পড়েছে হাওর দেখতে, এরকম দৃশ্য এখানকার রক্ষণশীল সমাজে খুব একটা দেখা যায় না।
আর ওই টাকমাথাওয়ালা ভদ্রলোকের নাম পরিতোষ সোম। থাকেন গাজীপুরে। নিজস্ব টেক্সটাইলের ব্যবসা রয়েছে। ওই মহিলা আর সন্তান তারই।
সকলেই যখন নিজেদের মধ্যে টুকটাক কথা বলছে, আড্ডা দিচ্ছে। ঠিক তখনই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো মাসুদ। চোখে মুখে একটা শ্রান্তির ছাপ।
“আপনারা সবাই চা নাস্তা খাইসেন?” কয়েকজন মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাতেই,মাসুদের ঠোঁটের কোলে একটা ম্লান হাসি দেখা গেল।
“ রাতের লিগ্যা চিকন চাউলের ভাত, হিঙের ডাইল,চার রকমের ভর্তা, ডিম ভাজি,আর দেশী মুরগীর মাংস রান্না হইব। চাটনি খাইতি চাইলে, বইলেন। চালতার চাটনি বানামু। কাল দুপুরে ইলিশের নতুন আইটেম করমু। আপনাগো ভালো লাগবো।“
মাসুদের কথা শেষ হতেই, ঈষিকা ফোন নামিয়ে,বলে উঠল, “ভাইয়া, আমরা কী হাওরে ঢুকসি?” মাসুদ মাথা নাড়িয়ে বলল, “এহনো মিনিট চল্লিশের মত লাগবো।“ কথাটা বলেই তার নজর পড়ল শতভুদের টেবিলে। পা পা করে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো মাসুদ।
“আপনেরা ইন্ডিয়া থেকে আইসেন? কথা শুইনা মনে হইল।“
প্রতিভাস মাথা নাড়াল, “ জ্বী!”
“আমারও ইন্ডিয়া যাওয়া লাগবো। ওই চেন্নাই না ভেলোরে? এহান থেইকা অনেকেই যায় ডাক্তার দেহাইতে।“
“ওহ!কারো কিছু হয়েছে?”
ঝুমুরের প্রশ্নে মাসুদ কয়েকমুহূর্ত চুপ করে রইল। “আমার মাইয়া। ওর হার্টে ফুটা আছে। ঢাকায় যাইয়া ডাক্তার দেখাইসি। চিকিৎসার অনেক খরচ। তাও ডাক্তেররা কথা দিতে পারতেসে না। তাই ভাবি ইন্ডিয়া লইয়া যাই।
শতভুর প্রশ্ন বাই দ্য ওয়ে, কবে যাচ্ছেন আপনি?”
এই কথায় মাসুদ যেন গুটিয়ে গেল অনেকটা। “অনেকগুলা ট্যাহা তো, প্রায় বিশ লাখ। এই ট্যাহাই তো,জোগাড় করতাসি। আজকার রাইতে, হাওরে বোট নামাইসি,এই ট্যাহার লিগাই। নাইলে...”
“আচ্ছা,আজকের রাতে হাওরে কী আছে?” রঙ্গনের অবাক গলায় প্রশ্ন,“সকলেই আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন?”
“হাওরে অনেক রহস্য আছে ভাই। যেই রহস্যের তল নাই। আর যে রহস্যের তল নাই,সেইহানে জনম লয় ভয়।“ তারপরেই একটু গলা নামিয়ে বলল, “আইজকার দিনে যেই বোট হাওরে যায়,

সেই বোট ফিরে আহে না কহনো। কয়েকবছর আগে শেষ একটি বোটও এমন যাত্রী নিয়া, হাওরে গেসিলো আইজকার দিনে। ওইটা আর ফিরা আহে নাই। পুরা বোট যেন উদাও হইসিলো।"
সায়নী খানিকটা ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, "কেউই ফিরে আসে নি?"
"ফিরা আইসিল একজন। আগের বোটের সাগরেদ। আমগো রিপনের মত। কিন্তু তার একটু মাথায় গোলমাল আসিলো। মাইনসে কয়, মাথায় সিট আসিল বলেই, দেইখাই হাওর ফিরাই দিসিলো।"
"তারপর?তারপর কী হল? সেই লোকের..."
"ফিরা আইয়া হ্যায় আরো পাগল হইলো। এক্কারে বদ্ধ পাগল। অয় বারবার হাওরে যাইতে চাইতো। বিশেষ কইরা বছরের আইজকার দিনে, হাওরে ফিরার লাইগ্যা পাগল হয়ে ওঠে। ক্যা এরম করে আমরা কেউই জানি না। কিন্তু আজকের দিনে হাওরে কোন বোট নামা নিষেধ যেহেতু, তাই হ্যার আর হাওরে আসা হয় না..."
কথাটা শেষ হওয়ার আগেই আচমকা একটা আর্তনাদ। সকলে চমকে উঠে দেখল, স্টোররুমের দরজাটা হাট করে খোলা আর ঠিক তার সমনেই দাঁড়িয়ে অন্ধকার স্টোররুমের দিকে আঙুল তুলে রিপন চিৎকার করছে।
"চাচা... বাঁচাও... চাচা বাঁচাও..."
মাসুদ ছুটে এলো স্টোররুমের কাছে। সেইসঙ্গে বাকিরাও। রিপন থরথর করে কাঁপছে ভয়ঙ্কর ভাবে। ছেলেটা ভয় পেয়েছে ভীষণভাবে।
"এই রিপন!রিপন? কী হইসে? এরম করস ক্যা?এই রিপন!" মাসুদ তার দুইকাঁধ ধরে একটা সজোরে নাড়া দিতেই রিপন কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, "চাচা, স্টোররুমে আমি কাউরে দেখসি। এহুনি। লম্বা কালো মত একটা শরীল..."
"তুই স্টোররুমে গেসিলি ক্যা?" কথাটা বলতে বলতেই,মাসুদ অন্ধকার স্টোররুমের মধ্যে ঢুকে গেলো।
"উপরের রুমগুলার জানালায় পর্দা আসিল না। ভাবলাম বাইর কইরা রাহি..."
কথাটা বলতে বলতে মাসুদ,একপাশের সুইচটা অন করতেই ঘরের মধ্যে একটা অনুজ্জ্বল হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়লো।
"কই?কেউ নাই তো..." মাসুদ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলও। এদিকে ততক্ষণে,দোতলা থেকে নেমে এসেছেন, বন্ধন সাহেব। কীসের কারণে,এই চিৎকার গোলযোগ তিনি বুঝতে না পেরে, খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন।
"ধুস! একটা বাচ্চা ছেলে। কী দেখতে কী দেখছে।" মহাসীন আলম কথাটা বলে নিজের টেবিলের দিকে ফিরে যেতেই রিপন প্রতিবাদী কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।
"চাচা,মিছা না। আমি সত্য..." কথাটা সে শেষ করতে পারলো না। তার আগেই মাসুদ তাকে হাত তুলে থামতে নির্দেশ ছিল। চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,ঘরের এক কোণে ডাই করে রাখা, চালের বস্তার আড়ালে। কী একটা নড়ে উঠল না?মাসুদ দেরী না করে, চালের বস্তার উপরে ঢাকা দেওয়া,চাদরটা একটা ঝটকা টান মেরে, টেনে নামাতেই,অনুজ্জ্বল বাল্বের আলোয়, ফুটে উঠল একটা শরীর। এতক্ষণ,বস্তার আড়ালে, লুকিয়ে ছিল সে। বছর আঠাশ ত্রিশের একটি ছেলে। পরনে একটা নোংরা লুঙ্গি, বোতাম ছেঁড়া হাফহাতা জামা। হাতে পায়ের বড় বড় নখে নোংরা, মুখে গোঁফদাড়ির জঙ্গল। মাথায় দীর্ঘদিনের না আঁচড়ানো চুল। সারা মুখে অবিন্যস্ত ভাব। তবে সেটা কয়েক মুহূর্তের

জন্যাই। মুহূর্তের মাস্থদের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি, বিশ্রী খিলখিলে হাসি হেসে বলে উঠল,"হাওর যামু... হাওর..."
ওকে আচমকা এই জায়গায় দেখে যাত্রীরা ভয় পেলে। মাস্থদের মুখ হয়ে রয়েছে বিস্ময়ে হাঁ।
"এই দুলা, তুই এইহানে কহন আইলি...?আর তুই এইহানে কী করস?"
উত্তরে ছেলেটি কিছু না বলে হাততালি দিয়ে উঠল বাচ্চাদের মত, তারপর আগের মতোই খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, "হাওর... হাওর... হাওর যামু... হাওরের হাওয়া... হাওরের পানি..."
ওদিকে রিপন শুকনো কণ্ঠে মাস্থদের দিকে তাকিয়ে বলল, "ও চাচা,এইবার কী হইব? এ যে দুলা! হাওরে যাইতে মাঝিরা অপয়া বইলা যার মুখ দেইখ্যা যায় না, সে যে ময়নামুখীতে..."
শতিভু এগিয়ে এলো কিছুটা সামনে, "ও মাস্থদ ভায়া,কে এটা? চোর টোর নাকি?"
মাস্থদ কিছু না বলে, ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো। গভীর চিন্তার কাটিকুটি তার সারা মুখে।
"কী হল মাস্থদ ভাই? কিছু বলছেন না যে,এ কে? আর এই ছোকরা এত ভয় পাচ্ছে কেন?"
মাস্থদ শতিভুর মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল, "একটু আগে কইতেসিলাম না, এতদিনে মাত্র একজনই ফিরসে হাওর থিকা। সে বদ্ধ পাগল হয়ে গেসিলো। এই সেই পাগল। দুলা। হাওরে আজকে কোন বোট ছাড়ে নাই। এ কহন জানে, খবর পাইয়া,সকলের চোখ এড়াইয়া উইঠ্যা পড়সে, এইহানে লুকায় আসিলো। এরে সদরের মাঝিরা অপয়া মনে করে। নদীতে যাওয়ার আগে এর মুখ ও দেহে না। মনে করে, এ খারাপ কিছু লগে লইয়া ঘোরে। রিপন ভয় পায়, কারণ সেই লোক এহন আমাগো এই বোটে।" কথাটা বলতে বলতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাস্থদ, তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "দোয়া কইরেন, ভালোয় ভালোয় যেন,হাওরে ঢুকতে পারি।"

২) যোজনগন্ধাঃ

মাসুদ ফ্যাকাসে মুখে সকলের মুখের পানে তাকালো। ড্রইং রুমে বসে থাকা সকলেই নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে। রিপন নামের ছেলেটা কাঠের দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। মাত্র মাসুদের নির্দেশে রান্নাঘরের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়েছে। যতই হোক,এইভাবে বসে থাকলে হবে নাকি। এত গুলো আইটেম রান্না করতে হবে তো। এদিকে তো বোটে একজন বাচ্চাও রয়েছে। তাড়াতাড়ি খাবারের ব্যবস্থা না করলে হবে কী করে?
“দেইখেন, পরিষ্কার কইরা রাখি। হাওরে ঢোকার মুহেই একহান জাগা আসে। যেই জাগারে আমরা ভয় পাই। আমরা তারে জাহান্নামের দরজা কই। আমরা যদি সময়ে বেইর হইতাম কুনো খতা আসিল না। দিনের আলোয় ভালোয় ভালোয় পার হইতে পারতাম। কিন্তু রাইতের আঁধারে সে জায়গা কী হইব জানা নাই। ওইহানে আমাদের সকলরে সাবধানে থাকতি হইব।“
“সাবধান?কেমন সাবধান? ডাকাত টাকাত পড়বে নাকি?” সায়নী কথাটা বলতে বলতেই শতিভুর হাত চেপে ধরল।
“তার চিয়েও ভয়ঙ্কর!” মাসুদের কপালে চিন্তার গভীর রেখা, “লোকে কয়,তার নাম আলাকুতি বিবি।“
“আলাকুতি বিবি?”
“হ্যাঁ,আলাকুতি বিবি। এই হাওরের ত্রাস। যে বছরের এই একটা সময়, আজকের রাতে জাইগা ওঠে। লোকে কয়, তার সারা গা থেকে মাসের আঁশটে গন্ধ আহে। সেই গন্ধ নাকি এক যোজন দূর থিকাও পাওয়া যায়।আর সেইহানেই ভয়। সেই জায়গাটা আসার আগেই আমাদের নাক বাইন্ধা ফেলাইতে হইব যাতি সেই গন্ধ আমাদের নাহে না আসে।“
“নাকে গন্ধ আসলে কী হবে?” মহাসিন বাবুর প্রশ্নে,মাসুদ মাথা নাড়াল। “সর্বনাশ হইয়া যাইব। আমরা হের গন্ধ পাওয়ার অর্থ, সেও আমাগো গন্ধ পাইয়া যাইব। আর একবার সে জানতি পারলে, যে হাওরে আইজ রাইতে মানুষ আইসে,তাইলে আর কারুরই বাইচা ফেরা লাগবো না।“
পরিতোষ বাবুর স্ত্রীর নাম শেফালি। ছেলেকে নিজের বুকের কাছে টেনে বললেন,“কতহন এই ভাবে নাক বাঁইধা রাখতি হইব?” তারপরই তিনি ফিরলেন স্বামীর দিকে, “এমন দিনে তোমারে হাওরে আইতেই হইল?আগে থিকা কিছু খোঁজ খবর লও না?”
“অল্পক্ষণের জন্যিই। কিন্তু করতেই হইব। ময়নামুখীর একজনেরও নাকের বাঁধন না থাকা চলবো না। শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারবেন আপনেরা। কিন্তু ওই কাপড়ের ভিতর দিয়া। শুধু তাই নয়, বোটের সকলে এইহানে থাকবেন। এই হল ঘরেই জমা হইবো। আমি বোটের আলো আর ইঞ্জিন দুইই অফ কইরা দিমুনে। কুনো শব্দ করা চলবো না। বোট স্রোতের টানে আগাইব। চিন্তা কইরেন না। সময় হলেই আমি সবাইরে জানামু। সব কিছু আবার আগের মত থাকবো। কিন্তু এইটা আপনাদের মানতেই হইব।“
আচমকা শতিভু উঠে দাঁড়ালো বিরক্তির সুরে, “হোয়াট এ বুলশিট!মজা পেয়েছেন নাকি? বোটের আলো ইঞ্জিন বন্ধ করে নাকে কাপড় দিয়ে বসে থাকবো সবাই।“
“কিন্তু উনি যে বলতেসেন!” ঈষিকা নামের মেয়েটি ভয় পেয়েছে বেশ, “এসব না করলে নাকি...”

“তুমি এগুলো বিশ্বাস করো?” শতিভুর গলায় উষ্মা। এই ধরনের লক্ষ লক্ষ মিথ, আর গাল গল্প সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। লোকে বলে... মাই ফুট!সবই এখানকার লোকের ধান্দাবাজি। এরা এসব গল্প বলে, টুরিস্ট দের ভয় দেখানোর জন্য। যাতে,এই টুরিস্টরা গিয়ে পরিচিত মহলে এসব বলে। লোকে সেসব শুনে আরো আগ্রহ পাবে। তারপর কৌতুহলের নিরসনেই, এই হাওরে দলে দলে ছুটে আসবে। এসবই এক ধরনের গেম।“ কথাটা বলার সাথে সাথেই, সে প্রতিভাসকে হাতের ইশারায়,উঠে আসতে বলল। তারপর মাসুদের দিকে ফিরে বলল, “ভাই, আপনি ভালো লোক। কিন্তু আপনার অবস্থাটাও বুঝি। এসব না বললে,আপনাদের রোজগার বাড়বে কেন? কিন্তু প্লিজ,এতোটাও করবার প্রয়োজন নেই। আমরা এই নাক টাক বেঁধে চুপ করে বসে থাকতে পারবো না।“

কথাটা বলেই শতিভু আর প্রতিভাস যেই দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোতে যাবে,মুহূর্তেই মাসুদ তার ডানহাতের কব্জি চেপে ধরল।

“আপনেরা শহরের মানুষ। শহরের বাইরের কতটুকু দেখসেন আমার জানা নেই। কিন্তু এটা আমাদের বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসরে আমরা সম্মান করি।“

শতিভু ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে নিতেই, মাসুদ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, “আমি বোট ছাড়ার আগে,একটি কথা কইসিলাম, আর অইডা হইল,আমি যখন যা কমু তাই করতে হইব। আপনাগো ভিতর যদি একজনেরও তা করতে আপত্তি থাকে তো,আমারে কোন। আমি এইহান থিকেই বোট ঘুরাইয়া ফিরা যামু। আমি একজনের লিগ্যা বাকীদের বিপদে ফেইলবো না।“

এই কথায় আচমকা, বন্ধনসাহেব উঠে দাঁড়ালেন। “আপনারা কী চাইতেসেন?আপনাদের জন্য মাঝি এইহান থিকা বোট ঘুরায়ে নিক?”

শতিভু খানিকটা হচকচিয়ে বলে উঠল, “আমি...আমি একবারও সেই কথা বলিনি...”

“তাহলে অল্প সময়ের লিগা নিয়ম মনতে অসুবিধে কোই? উনি তো কিছুক্ষণের জন্যই বলতেসেন...” শতিভু বাকী সকলের মুখের দিকে তাকালো। মুখ দেখে মনে হচ্ছে উপস্থিত সকলেই সম্ভবত বন্ধন সাহেবের কথায় রাজী হয়েছেন।

“বেশ। আমরাও রাজী। কতক্ষনে শুরু হবে এসব?”

মাসুদ একবার জানালার বাইরে ঘাড় বের করে উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নিলো। “হয়েই এসেছে প্রায়।এইখানেই থাকেন।সকলের কাছেই কিছু না কিছু নাকে ঢাকা দেওয়ার মতো কাপড় আছে তো?“

শতিভু প্রতিভাসকে কী একটা ইঙ্গিত করতেই, ওরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

“কোই জাইতাসেন আবার? সময় নাই তো...”

“সিগারেট খেয়ে আসছি এক্ষুনি। সময় হলে, আপনার ওই ছোকরাকে পাঠাবেন,চলে আসবো।“ কথাটা বলেই এক মুহূর্ত দেরী না করে দুমদাম পায়ের শব্দ করতে করতেই তারা দুজনেই উপরে উঠে গেল।

****

বিছানার উপরে ঘাড় গুঁজে বসে রয়েছে প্রতিভাস। শতিভু সিগারেটের টুকরোটা জানালা গলে,বাইরে ফেলে তার কাঁধে হাত রেখে বলল “চিন্তা করছিস কেন?আমি আছি তো?”

ঠিক এমন সময়েই, আচমকা চারিদিকটা যেন নিস্তব্ধ হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে মাথার উপরের আলোটা কেমন জানি দপদপ করে উঠল। আর ঠিক তখনই, দরজায়,ধাক্কা দেওয়ার শব্দ।
শতিভু তড়িঘড়ি কেবিনের দরজাটা খুলে দেখল, রিপন নামের ছেলেটি দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। নাকের ওপরে একটা কাপড়ের টুকরো ভালো করে বাঁধা। মুখটা আচমকাই কেমন জানি তার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ভয়ে কী?
"চাচা খেয়াল করে নাই, আমরা এলাকায় ঢুইক্যা পড়সি। চাচা ইঞ্জিন বন্ধ করসে। সব আলো এহুনি নিভা যাইব। নীচে আসেন জলদি। নাক বাইধ্যা লন।" কথাটা বলেই ছেলেটি ছুটল সিঁড়ির দিকে।
ওরা দুজনেই তড়াক করে লাফিয়ে কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এলো। ঝটপট হাতে, রুমালটা বের করে,নাকে চেপে ধরেই ছুটল সিঁড়ির দিকে। ওই তো, ওই তো সবাই জড়ো হয়েছে নীচে। কিন্তু নীচে নামার আগেই, ঝুপ করে, আলো নিভে,পুরো বোট অন্ধকার হয়ে গেল।
শতিভু কিছু একটা বলতে যেতেই, মাসুদের গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে উঠল,"চুপ! আর একটাও কথা নয়। চুপ কইরা থাহেন।"
মুহূর্তেই পিন পতন নিস্তব্ধতা নেমে এলো পুরো বোট জুড়ে। সবাই চুপ কেউ কোন কথা বলছে না। ইঞ্জিন বন্ধ, তাও বোট স্রোতের টানে সামনে এগিয়ে চলছে। তারই ছলাৎ ছলাৎ শব্দ পুরো বোট জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে এক কুজ্ঝটিকাময় ঘন অন্ধকার। একহাত দূরের বস্তুই ঠিক করে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জানালার বাইরের দিকে তাকালে চাঁদের ঈষৎ আলো চোখে পড়ে। তবে কী সত্যিই চাঁদ উঠেছে। এতক্ষন বোটের ভিতরের আলোয়, এই প্রাকৃতিক আলো চোখে পড়েনি। বেশ কিছুক্ষণ,এইভাবে নাক বন্ধ করে নিশ্চুপ বসে থাকার পর আচমকাই পুরো বোট খানা ঝাঁকুনি মেরে দুলে উঠল যেন। শতিভু অন্ধকারের মধ্যেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিভাসকে আঁকড়ে ধরল নাহলে,মুহূর্তেই মুখ থুবড়ে পড়তো। বোট কিছুতে ধাক্কা খেল নাকি? কথা বলা বারণ তাই প্রশ্ন করবার উপায় নেই। কিন্তু এইভাবে আর কতক্ষণ? মিনিট দশেক তো হলো। এখনো কী সেই জায়গাটা পার হয়নি ওরা।
আচমকা,দপ করে বোটের পুরো আলোটা জ্বলে উঠল। সেই সঙ্গে,চালু হলো ইঞ্জিন। ঘড়ঘড় করে শব্দটা ছড়িয়ে পড়তেই, এই যে কিছু সময়ের ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা,কয়েক মুহূর্তের জন্য কোথায় যেন হারিয়ে গেলো।
ওদিকে মাসুদ ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে ইঞ্জিন ঘর থেকে মুখে একটা স্বস্তির হাসি।
শতিভু সহ বাকি সকলেই নাক থেকে তাঁদের বাঁধন সরিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। মাসুদ এসে শতিভুর হাত জোড়া চেপে ধরল।
"আপনারে অনেক বেশি কথা বইলা ফেলাইসি। মাপ কইরা দিয়েন। আমি আসলে..."
"আরেহ,ইটস ওকে। এরকম এক সঙ্গে থাকতে গেলে অনেক কিছু হয়। জায়গাটা পেরিয়ে এসেছি তো?"
"হ। ওই যে বোটখান দুইল্যা উঠল, ওটাই তো...যাক গে,সকলে মজা করেন। বিপদের জ্যায়গাটুক পার হইসি। আর ভয় নাই। যাই হোক আমি রান্না বসাই..."
মাসুদ কথা বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে এগোতে গিয়েও থমকে গেলো। দোতলা থেকে একতলার সিঁড়ি বেয়ে নামলে, কাঠের পাটাতনে অদ্ভুত এক মচমচ শব্দ তৈরী হয়। এই মুহূর্তে সেই

শব্দই হচ্ছে। কেউ একজন নামছে দোতলা থেকে। তার মানে?কেউ এখানে অনুপস্থিত ছিল? সে উপরে ছিল? হে,আল্লাহ! কে ছিল না এখানে?
মুহূর্তেই শতিভুর চোখ ফিরল, বাকীদের দিকে। মুহূর্ত মাত্র সময় লাগলো অনুপস্থিত ব্যক্তিটিকে খুঁজে বের করতে। সর্বনাশ! সায়নী!
****
তিনতলার ছাদে রেলিং এর ধার বরাবর দাঁড়িয়ে রয়েছে সায়নী। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এক নাগাড়ে কেঁদে চলছে সে। তার মনে হচ্ছে,তার আশেপাশের পৃথিবীটা একটু একটু করে শেষ হয়ে যাচ্ছে যেন। এটা কী হল?কেন হল? একটু আগে যা ঘটল,তা কী সত্যি ঘটল? নাকি যা দেখল তার মনের ভুল?নাহ, মনের ভুল কী করে?সে যে নিজের চোখে দেখল ব্যাপারটা। এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না।
চোখের সামনে সিনেমার মত দৃশ্যগুলো আবার ভেসে উঠল যেন। শতিভু আর প্রতিভাস সিগারেট খেতে উপরে উঠে যেতেই, ঝুমুর সাথে সাথে সায়নীকে প্রশ্ন করল।
“সায়নী,তুমি নাকে কী ঢাকা দেবে? ওড়না নেই?”
সায়নী খেয়াল করল, সে একটা পালাজো আর লঙ কটনের কুর্তি পরে রয়েছে। “যাহ!কী হবে এবার?”
“কী আবার হবে? যাও, ওপর থেকে নিয়ে এসো। সকলেই তো নাকে ঢাকা চাপা দেবে।“
“না মানে, এখনই যদি শুরু হয়ে যায়?আর সত্যি বলতে কী এসব শোনার পর আমার ভয় করছে...। তুমি সঙ্গে চলো।”
“আরেহ বাবাহ! ভয় করবে কেন? ওরা গেল তো উপরে। যাও“ ঝুমুরের কথায় সায়নী উঠে দাঁড়ালো, “তাই তো। দুই বন্ধু তো এক্ষুনি উপরে গেল।“
কথাটা বলে, মুহূর্ত মাত্র দেরী না করে,সায়নী উপরে উঠে এলো। আর উপরে উঠে আসতেই, আচমকা তার কানে,শতিভুর উচ্চ শব্দ শোনা গেল। শতিভু কী এখনো ওই নাক বন্ধ করে রাখার ঘটনায় রেগে আছে?উফ! এই একটা ছেলে। অল্পেই মাথা গরম। কী এমন হয়েছে, কিছুক্ষণ নাক ঢেকে রাখলে। বিদেশ বিভুঁই তে একটু অ্যাডজাস্ট তো করতেই হয়। তাই না... কিন্তু একে কে বোঝাবে।
ঠিক তখনই আবার প্রতিভাসের উত্তপ্ত স্বর কানে এলো সায়নীর। শব্দগুলো শুনে,মুহূর্তেই সায়নীর মনে হল, কে যেন তার পুরো শরীরটাকে জমিয়ে দিয়েছে হুট করেই।
“তুই সায়নীকে কবে বলবি আমাদের কথা? Does she knows anything about us? আমাদের সম্পর্কের কথা? বিয়ের ডেট কিন্তু একটু একটু করে সামনে এগিয়ে আসছে শত।“
সায়নী কোন রকমে পা পা করে এগিয়ে গেল, ওদের দরজার দিকে। এসব কী শুনছে সে? শতিভু আর প্রতিভাসের সম্পর্ক? মানে? দারজাটা পুরোপুরি বন্ধ নয়। এক চিলতে ফাঁক রয়েছে সেখানে। সায়নী দেরী না করে, দরজার সেই ফাঁকে চোখ রাখল, কোন শব্দ না করে।
“দেখ, সব কিছু এত সহজ নয়। তুই চাইছিস মানেই, হুট করে সব কিছু হয়ে যায় না। মেয়েটা সেন্সেটিভ। আমায় সময় নিয়ে ওকে বোঝাতে হবে জিনিসটা। এর মধ্যে আমাদের ফ্যামিলি ইনভল্বড।“

“সে সব আমি দেখতেই পাচ্ছি। সত্যিটা বলবার ইচ্ছে থাকলে, অনেক আগেই তাকে সব বলতে পারতিস। কিন্তু তুই বলিসনি। হয়তো তুই বলতেই চাস না।“
“মানে?”
“মানে? হয়তো তুই বিয়েটা করতেই চাস। দেখতেই তো পাচ্ছি, তোর মুভমেন্ট গুলো।“ সাথে সাথে, শতিভুর জামার কলার চেপে ধরল প্রতিভাস, “তুই অস্বীকার করতে পারবি, যে ওর প্রতি তোর ফিলিংস তৈরী হচ্ছে না? বল, করতে পারবি অস্বীকার?”
শতিভু কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলে উঠল, “নাহ, এটা সত্যি। আমার ওর প্রতি একটা ফিলিংস তৈরী হয়েছে। তার কারণ মেয়েটা অনেক ভালো। একটু বাচ্চামো...”
“ব্যাস! তাহলে তো বোঝাই গেল।“ কথাটা বলেই ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল, প্রতিভাস। শতিভু সিগারেটের একটা টান দিয়ে বসে থাকা, প্রতিভাসের মাথাটা নিজের বুকের কাছে টেনে এনে বিড়বিড় করে বলে উঠল, “তুই কিছুই বুঝিস না প্রতি। কিছুই বুঝিস না। আমি তোকে ভালবাসি এটাই সত্যি। কিন্তু মেয়েটাকে আমি কষ্ট দিতে চাইছি না। আমায় তুই শুধু একটু সময়...”
না আর শুনতে পারছে না সায়নী। কী করবে সে? কোথায় যাবে? সে যে স্বপ্ন দেখছিল এতদিন ধরে, সেটা এমন একটা মিথ্যা স্বপ্ন? মুহূর্তমাত্র দেরী না করে, সে ছুটে এসেছে ছাদে। আর এসে থেকে এক নাগাড়ে কেঁদেই চলেছে। ইশ! কী ভয়ঙ্কর একটা ভুল। সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না কিছুতেই।
আচমকা, চারিদিক শান্ত হয়ে গেল। একটু আগেই বোটের নিচতলা থেকে মোটরের যেই শব্দটা ভেসে আসছিল, ওটা হুট করে বন্ধ করে দিয়েছে কেউ। কী হল? ইঞ্জিন বন্ধ হল কেন? হোক গে যাক, তার কিছুই ভালো লাগছে না এখন। কোনোরকমে ফিরে যেতে পারলেই বাঁচে...
ভাবনায় কথাটা শেষ হল না, তার আগেই, পুরো স্টিমারের আলোটা ঝুপ করে নিভে, চারিদিক, কেমন যেন অন্ধকার হয়ে গেলো। আর ঠিক তখনই সায়নীর মনে পড়ল, মাসুদ মিয়াঁর বলা কথাগুলো। সর্বনাশ! সে তো একদম ভুলেই গিয়েছিল, কথাগুলো। এখন কী হবে? ইঞ্জিন বন্ধ! আলো বন্ধ! সকলে নিশ্চয়ই নাকে ঢাকা দিয়ে নীচে জমা হয়েছে। আর সে, এই উপরে একলা? একটা শিরশিরে ভয় ছড়িয়ে পড়ছে, তার শরীর জুড়ে। সাথে সাথে দুই হাতে করে নাক চাপা দিলো সে। অন্ধকারে তো সে, নীচেও যেতে পারবে না। ঠিক তখনই তার দৃষ্টি পড়ল, সামনের দিকে। ম্লান চাঁদের আলোয় পরিষ্কার করে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারপরেও সে যেন দেখতে পাচ্ছে, তার থেকে হাত পঞ্চাশেক সামনে, ঠিক মাঝ নদীর বুকের উপরে, শূন্যে ভেসে রয়েছে, একটা লম্বা কালো শরীর। ওদের বোট স্রোতের টানে, যত সামনের দিকে এগোচ্ছে। সেই কালো ছায়া মূর্তিটা যেন আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কিন্তু ও কী? বোটটা থেকে জিনিসটার দূরত্ব যখন মাত্র হাত পনেরো, ঠিক তখনই সেই ছায়াটা বদলে, গেলো, একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে। তারপর মিলিয়ে গেলো বাতাসে।
আর জিনিসটা বাতাসে মিলিয়ে যেতেই, আচমকা সায়নীর সারা শরীরের লোম, একটা একটা করে খাঁড়া হয়ে যেতে লাগলো আপনা থেকেই। হাতের ফাঁক গলে তার নাকে ধাক্কা মারছে, একটা তীব্র আঁশটে গন্ধ। একটা দমবন্ধ করা আঁশটে গন্ধ! আলাকুতি বিবির আঁশটে গন্ধ! তারমানে... তারমানে, সেই ভয়ঙ্করীও পেয়েছে সায়নীর দেহের গন্ধ? এবার? এবার কী হবে? নাহ বেশি ভাবার

সুযোগ পেল না সে, তার আগেই, একটা অন্ধকার পর্দা, কোত্থেকে জানি, এসে, তার চোখের সামনের সবকিছু ঢেকে দিলো। তার আর কিছুই মনে রইল না।
****
সিঁড়ির নীচের ধাপে সায়নী এসে দাঁড়াতেই সকলের মুখ, বিস্ময়ে হা হয়ে গেলো। এ কী অবস্থা হয়েছে তার? সারা শরীর জলে ভিজে সপসপ করছে। কাপড় থেকে ফোঁটাফোঁটা জল পড়ে কাঠের মেঝে ভিজিয়ে দিচ্ছে। সারা শরীর এমনভাবে টলছে, যেন যে কোন মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে সে। আর হলোও তাই, মুহূর্তে মাথা ঘুরিয়ে মেঝেতে, পড়বার আগেই, শতিভু তাকে দুইহাতের মধ্যে আঁকড়ে ধরল।
"সায়নী সায়নী... এই সায়নী...কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?"
মাসুদ দেখল, মেয়েটার চোখের পাতা বন্ধ কিন্তু বিড়বিড় করে কী যেন সে বলে চলছে। মাসুদ মিঁয়ার হাঁটু কাঁপছে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বলছে, কিছু একটা ভয়ঙ্কর ঘটে গিয়েছে, তারই অগোচরে। তারপরেও সে, মেয়েটির কাছে, হাঁটু গেঁড়ে বসে, নিজের কানটা খুব ধীরে ধীরে নিয়ে এলো মেয়েটির মুখের কাছে।
"হাওরের হাওয়া...হাওরের পানি...
আলাকুতি বিবি... হাওরের রানি... আসছে সে...আসছে...পালাও..."
মুহূর্তেই একটা কনকনে শীতল স্রোত নেমে গেল যেন মাসুদের শিরদাঁড়া দিয়ে। মেয়েটা কী বলছে এসব? তারমানে কী হাওরের ত্রাস, জেনে গিয়েছে হাওরে আজ মানুষ নেমেছে? এরপর? এরপর কী হবে?
ঠিক তখনই মাথার উপরের উজ্জ্বল আলোটা ভয়ঙ্কর ভাবে দপদপ করে উঠতেই, ঘরের এক কোণে বসে থাকা সেই হুলা পাগল চিৎকার করে উঠল ভয়ঙ্কর ভাবে। যেন এক মরণ আর্তনাদ! দপদপে আলোর ভিতরেই, সকলে তার দিকে তাকাতেই, দেখা গেলো, সে আঙুল উঁচিয়ে, কাঠের রেলিং এর ওপারে, কী যেন, দেখানোর চেষ্টা করছে। প্রতিভাস ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, কোত্থেকে জানি একটা প্রচণ্ড ধোঁয়াশা মুহূর্তের মধ্যে, ওদের হাউসবোটটাকে চারিদিকে ঘিরে ফেলছে অতিদ্রুত। সেই ধোঁয়াশা ভেদ করে, বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু তাই নয় সেই ধোঁয়াশাটা একটু একটু ছড়িয়ে পড়ছে হলঘরের ভেতরেও।
মহাসিন সাহেব, একটু ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন, " এগুলা কী? এগুলা কী? কী এগুলা..."
মাসুদ, তার মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্যাক্যাশে স্বরে বলে উঠল, " আমরা কেউ বাঁচুম না। হ্যায় আমাগো গন্ধ পাইসে। সে আইতাসে... সে আইতাসে..."

পর্ব তিন

১) মরা হাওরঃ

শতিভুর এইসব কথা কানে ঢুকছে না। সে অচেতন হয়ে পড়া শায়নী কে ঝাঁকাচ্ছে,"এই সায়নী! সায়নী! কী হয়েছে? কথা বলছো না কেন?সায়নী চোখ খোলো। এর কী হয়েছে, প্রতি? দেখ না তোরা একটু... ডাক্তার? কেউ ডাক্তার আছেন এই ঘরে?"
সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো মাসুদ। তারপর সায়নীর দিকে একটা তর্জনী তুলে বলল,"এ আর ঠিক হইব না। হ্যারে,কেউ বাঁচাইতে পারব না। শুধু হেরে ক্যা, আমাগো কাউরে আর..."
মাথার উপর, আলোটা আরো ভয়ঙ্কর ভাবে দপদপ করে উঠল। এক্ষুনি বাল্বটা হয়তো কেটে যাবে। হলঘরের ভেতরটা, ঘন ধোঁয়াশায় ভরে যাচ্ছে,দুফুট দূরের মানুষও দেখা যাচ্ছে না, এতো ঘন কুয়াশা। উপস্থিত মহিলাদের ভেতর থেকে, একটা চাপা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। কে একটা যেন কাঁদছে?কিন্তু কে? ঘন ধোঁয়াশায়,মানুষগুলো যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে, অচিরেই। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মানুষগুলো একে অপরের নাম ধরে ডাকছে, কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। এমন সময় দপ করে, মাথার উপরের আলোটা নিভে, চারিদিক ভরে উঠল, আবার সেই আগের মত ঘুটঘুটে অন্ধকারে। আর মুহূর্তেই,পুরো বোটটা নড়ে উঠল যেন। নাহ, দুলুনি নয়। কেউ যেন দুহাতে করে, পুরো বোটাটা ঝাঁকাচ্ছে। এতক্ষণের চাপা আর্তনাদ গুলো ভয়ঙ্কর ভাবে আছড়ে পড়ল অন্ধকার বোটের কোণে কোণে। সবাই যেন, মরণ আর্তনাদ করে উঠল। মাসুদ মিয়া অন্ধকারেই ছিটকে পড়ল বোটের মধ্যে। টেবিলের কোণে মাথায় ধাক্কা লেগে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল সে। কিন্তু কতক্ষণ এইভাবে? কয়েকমুহূর্ত পর, সবাই টের পেলো সেই ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনিটা থেমে গিয়ে, সারা ঘরের মধ্যে শুরু হয়েছে, গরম হাওয়ার প্রবাহ। দেখতেই দেখতে, একটা গরম হাওয়ার ঝড় উঠল যেন ঘরের মধ্যে। ওদিকে আচমকা, গতি বাড়িয়ে ময়নামুখী তীব্রগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হুট করেই। কে যেন, প্রচণ্ড আক্রোশে, ময়নামুখীকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।
"রিপন, ইঞ্জিন ঘরে যা। ইঞ্জিনখান বন্ধ কর..." চিৎকার করে উঠল মাসুদ। কিন্তু কোথায় রিপন? কোথায় কে? সেই আর্তনাদের ভিতর দিয়ে কেউ কোন সাড়া দিলো না। ধুপ ধাপ জিনিসপত্র পড়ছে। অন্ধকারেই জলের ভিতর আচমকা ছপাক করে একটা শব্দ হল। কেউ জলে পড়ল? নাকি কোন জিনিস! হায় ঈশ্বর!
কতক্ষণ যে এইভাবে, ওরা চলল, কে জানে। শুধু চিৎকার, আর্তনাদ আর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তীব্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া ময়নামুখী। আচমকা, একটা তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ। আর ঠিক তারপরেই একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ময়নামুখী। শুধু থেমেই গেল না। অন্ধকার বোটের সবকটা আলো দপ করে জ্বলে উঠল একই সঙ্গে। মাসুদ অবাক চোখে দেখল, একটু আগের গোটাঘর ঢেকে দেওয়া সেই অন্ধকার ধোঁয়াশা, এই মুহূর্তে আর কোথাও নেই। না এই একতলায়, না বাইরে। যে যার মত মেঝেতে ছিটকে পড়ে আছে এদিক ওদিক। আলো ফিরে আসতেই সকলের সেই আর্তনাদটা কমে গেল বটে, কিন্তু প্রত্যেকের মুখই ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে।

মাসুদ, তার পাশে পড়ে থাকা প্রতিভাসকে হাত ধরে, তুলে দাঁড় করালো। বাকিরাও, যে যার মত করে উঠে দাঁড়িয়ে। সকলেই ভয়বিহ্বল অবাক চোখে একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।
"কী অইল ইডা এক্ষুনি?" বীথি নামক মেয়েটির গলার ভেতর থেকে যেন আওয়াজ বেরোচ্ছে না। মাসুদ মাথা নাড়াল সে জানে না নিজেও। কী হল এক্ষুনি।
"এসব থেমে গেলোই বা কেন হুট করে? তাহলে কী বিপদ কেটে গিয়েছে?" রঙ্গন, জানালার বাইরের দিকে তাকালো। অন্ধকার ছাড়া তার আর কিছুই চোখে পড়ছে না।
"চলেন আমরা ফিরা যাই, আর হাওরে গিয়ে কাজ নাই।"
মহাসীন সাহেবের স্ত্রী তার স্বামীর হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন, "হ, চলেন। ফিইরা যাই। এইডা ভালো লাগে না। ডর..." কথাটা শেষ করবার আগেই, মহাসীন সাহেব, নিজের স্ত্রীর পানে, বড়বড় চোখ করে তাকাতেই মহিলা চুপ করে গেলেন, " আমি থাকতে, তুমি কথা বলো ক্যান? আমার মাথার উপর দিয়া যাও?"
"শোনেন," মহাসীন সাহেব এগিয়ে এলেন, মাসুদের দিকে, "আমার মনে হয়, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত। যদি দেহি সেরম কিছু না হয় তখন নইলে..."
"অপেক্ষা? কীসের অপেক্ষা?" মহাসিন সাহেবের কথা শুনে চিৎকার করে উঠল রঙ্গন। "আপনি দেখতে পেলেন না, কী হলো এক্ষুনি? এক্ষুনি যা ঘটল, তাতে, আমরা মারা যেতে পারতাম।"
"পারতা, কিন্তু মারা তো যাও নাই। এমন কী কারুরই কিছু হয়নি। তাহলে সমস্যা কোই? হ, একটু বিপদ ছিল। বাট কেটে গেসে।"
"এগলা কী কন আপনে?" ঈষিকা নামের মেয়েটি কথা বলে উঠল উষ্ণ স্বরে। "মাঝি ভাইয়া তো বলল, আজকের রাতে হাওর আইলে কী হবার পারে। একটু আগেও একটা ঘটনা ঘটল। তারপরেও কইতেসেন, দেইখ্যা যাইতে? কী ধরনের কথা এগুলা?"
"আমার মনে হইতেসে, উনারা সঠিক কইতেসেন।" পরিতোষবাবুও ওদের সঙ্গে গলা মেলালো। "আমাগো ফিরে যাওয়া উচিত। এইহানে থাকা আর ঠিক হইব না।"
ঝুমুর দেখল সেই বন্ধন সাহেব পা পা করে জানালার সামনে এগিয়ে গিয়ে বাইরে কী একটা দেখার চেষ্টা করছেন।
"ফিরে যাইবেন মানে কী? এতোগুলো টাকা এইভাবে দিয়ে বোট বুক করিসি, হাওর না দেখাই ফিরা যাইব বলে?"
শতিভু এরই মাঝে সায়নীকে পাঁজকোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "ঝুমুর! আয় একটু। আমি কেবিনে যাচ্ছি। এর গায়ে জ্বর আসছে।"
মুহূর্তেই ঝুমুর আর শতিভু সায়নীকে নিয়ে দোতলায় চলে গেলো। সায়নী ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপছে। ওর এক্ষুনি, গায়ে ঢাকা দিতে হবে।
"আমি আর যামু না। এইহান থেকে ফিরমু। এতোগুলো মানুষরে লইয়া..." মাসুদ কথাগুলো শেষ করতে পারল না, তার আগেই
"মাসুদ মিয়াঁ!" আচমকা, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা, বন্ধন সাহেবের গম্ভীর গলাটা ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। "আপনের বোটে, বড় ফ্ল্যাশ লাইট আসে?"
"নাহ! নাই। ক্যান?" মাসুদ, লোকটির কলার ছেড়ে দিয়ে সরাসরি তাকালো, বন্ধন সাহেবের দিকে।

বন্ধন সাহেব সেই কথার জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, “আমরা না হাওরে যাইতে পারুম। আর না, ঘাটে ফিরতে পারুম। আমরা হয়তো অন্য কোথাও পৌঁছে গিয়েসি।“
“কী!” সম্মিলিত বিস্মিত স্বর ছড়িয়ে পড়ল ঘরের ভেতরে। কিন্তু বন্ধন সাহেব সেই কথার উত্তর না দিয়ে কেবল বাইরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। মাসুদ দ্রুত পায়ে, ইঞ্জিন ঘরে ঢুকে, চট করে বের করে আনলো, একটা হাইসেলের উজ্জ্বল টর্চের আলো। তারপর প্রায় এক ছুটে বড় জানালার কাছে, সরে এসে, বাইরের দিকে টর্চের আলো নিক্ষেপ করতেই, একটা কনকনে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে।
কুয়াসার চাদরে ঢাকা এক সুবিশাল জলভূমি। শান্ত স্থির কালো জল। কোন ভূমি নেই। দ্বীপের মত জেগে থাকা গ্রাম নেই। চাঁদের আলো ছাড়া কোন আলো নেই। কোন শব্দ নেই। এমনকি, ঝিঁঝির ডাক পর্যন্তও নেই। জলের মধ্যে, মাছের বুদবুদ টুকুও নেই। এক নিশ্চুপ , স্থির, নিস্তব্ধ পরিবেশ। যেন অন্য কোন জগত এই জায়গাটা। মাসুদের গলাটা শুকিয়ে এলো হঠাৎ করেই।
টলমল পায়ে, কাঠের মেঝের ওপরেই ধপ করে বসে পড়ল মাসুদ।
“আর পালানোর কোন পথ নাই, সেই রাক্ষুসী আমাদের এনে ফেলসে, মরা হাওরে।“
“মরা হাওর? সেটা আবার কী?”
“এক অলীক হাওর।“ বন্ধন সাহেবের গলা স্থির। “কথায় কয়, হাওরে যারা মরে, তাঁরা না যায় জন্নতে, আর না যায় জাহান্নামে। তারা নাকি আটকা থাকে মরা হাওরে। মরা হাওরে, কোন জিনিস বেঁচে থাকে না। আর যারা বাঁইচে থাকে, তাঁদেরও মরতে হয়। একটু আগে যা ঘটল, তা ছিল মরা হাওরের পানে আমাদের ধেয়ে আসা মাত্র। আর এই, মরা হাওর হইল, আলাকুতি বিবির বাসা। আলাকুতি বিবি, আমাদের তাঁর নিজের ঘরের দোরগড়ায় টাইন্যা আনসে। আমাগো মারব বইল্যা।“

২) আলাকুতি বিবিঃ

"আপনি? আপনি এতো কিছু কি করে জানলেন?" রঙ্গন অবাক স্বরে প্রশ্নটা করতেই কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন বন্ধন সাহেব। এই ভয় বিহ্বলতার মাঝেও, সকলে একই অবাক দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকালো।
রঙ্গন সাহেব কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, "আমি এহন রাজশাহী থাকলেও ছোটবেলা আমার কাটসে তাহিরপুরেই। আমার নানু বাড়িতে। আপনারা অনেকেই জানবেন, আমরা সুনামগঞ্জ থেকে বোটে করে আইলে। আসলে তাহিরপুরই হইল, হাওরে যাওয়ার মূল ফটক। মূলত, এই তাহিরপুর এলাকা থিকাই হাওরে প্রবেশ করতে ওয় । সুডোবেলায়, আমার মা মারা যান। তারপর থেকে আমার এহানেই বাস। তাই হাওর আমার জীবনের সঙ্গে মিশে আসে।"
"সবটা কী আপনার দাদুর থেকেই শোনা?"
"কইতে পারেন, তবে আমার নানা নিজে হাওরে নৌকা চালাইতেন। তহন দরকার টুকুই মেটানো হইত। যেমন আওন যাওন মালপরিবহন। হাওরের মাঝে জাইগ্যা থাকে সুটো সুটো গ্রাম। হেইগুলারে অনেকডা সটো দ্বীপের মত দেখতে লাগে। আমরা অরমই একটা গ্রামে থাকতাম। তহন আমার কিশোর বয়স, আচমকা এক গভীর রাতে, নানুর ভয়ানক পেটে ব্যাথা শুরু হয়। সেই যন্ত্রণার চিৎকার এহনো আমার কানে বাজে। আমার মামা, আর নানা মিলে নানুকে সদরের হাসপাতালে, নিয়ে যাওনের লাইগ্যা হাওরে নৌকো নামাইতেই, সকলে মিলে আটকায় তাঁদের। সকলে কয়, আজ নাকি আলাকুতি বিবির রাত। আজকে হাওরে না নামতে। আর নানু যন্ত্রণায় যা চিৎকার করতেসিল, আজ হাওরে নামলে তাঁরা ফিরতে পারব না। কিন্তু নানা শোনে নাই। নানুরে অনেক ভালোবাসত তো। আমায় ঘর জাগতে বলে, তারা নানুকে নিইয়া সেই রাতেই হাওরে পাড়ি দেয়। সেই যে পাড়ি দিসে তাঁরা আর ফেরে নাই। সেদিনের পর তাঁদের কোনোদিন আর দেখতে পাওয়া যায় নাই। আশেপাশে যারা ছিল, তাঁরা আমায় বোঝায়, আমার মামা, নানা, নানু আর কহনই ফিরবে না। নিশ্চয়ই নানুর চিৎকার, আটকাতে পারেন নাই আমার নানা। তাই আলাকুতির কোপ থেকে তাঁদের কেউ বাঁচাইতে পারেনাই। ওই দিনের পর থেকে আমি ঠিক করি, এই আলাকুতি বিবি সম্পর্কে সব জানমু আমি। তবে সমস্যা হইল, সবডাই মিথ। কোন সত্যতা নাই।"
বন্ধন সাহেব একটানা কথা বলা শেষ করে, কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ইতিমধ্যেই উপর থেকে নেমে এসেছে শতিভু। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। "ঝুমুর কে ওর সঙ্গে রেখে এলাম, প্রতি। মেয়েটার জ্বর তো, বাড়ছে। একটা প্যারাসিটামল দিলাম। কাজ হবে কিনা কে জানে।"
"কিন্তু কে হেই আলাকুতি?" পরিতোষ সোম, কখন যেন ছেলেকে কোলে তুলে নিয়েছেন। ওই বছর ছয়েকের বাচ্চাটাও। ভয় পেয়ে কেমন যেন চুপ করে গিয়েছে।
"ঠিক জানা নাই। তবে লোকমুখে যা শুনসি, সেহান থেকে কিছুডা ধারনা করা যায়। অনেককাল আগে, হাওর অঞ্চলে, এক সিদ্ধ মহিলার আবির্ভাব ওয়। তার নাকি অনেক বিশেষ ক্ষমতা আসিল। মানুষের মঙ্গল করসে সে। হাওর অঞ্চল, গরীব মাইনষের অঞ্চল। অসুখ বিসুখ হইলে সব সময় তাগ ক্ষমতা আসিল না ডাক্তার বদ্যি দেহায়ের। ঠিক অইহানেই আলাকুতি বিবির জয় হয়ে গিয়েসিল।

মানুষকে কইতে হইতো না, তার আগেই কোনো এক ক্ষমতায় সে নিজের ডিঙিখানা বাইয়া, হাজির হইত গ্রামের মাটিতে। বিনা ট্যাহা লইয়া, মানুষের জ্বর, জ্বালা অসুখ ভ্যানিস করে দিতো চোখের নিমিষে। শুধুকী তাই, ভূতে ধরা, তন্ত্র মন্ত্র করেও মানুষের নানান উপকার করসে সে। দেখতে দেখতে হাওর অঞ্চলের বিবি মা হয়ে উডল সে। সগলে তারে সন্মান করতো। সে যা কইত, গ্রামের মানুষদের তাই শিরোধার্য হইত।"

"তারপরে আইলো শীতের সময়। পানি নেমে গেলো হাওর থেইক্যা। চাষা বাস শুরু করল। কিন্তু কী যে হইল জানি না, সে বছর চাষ হইল না ঠিক কইরা। ফলন ও হইল না। কিন্তু এলাকার জমিদারকে খাজনা তো দিতে হইব। সে শুনব ক্যান? শুরু হইল, নিপীড়ন। আর ঠিক সেহানেই আগায় আইল, আলাকুতি বিবি। বিরোধিতা করল, সেই নিপীড়নের। শুধু তাই নয়, মানুষদের একজোট কইরা, সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষণা করল। আর তহনই সে জমিদারের বিষ নজরে পড়ল। শুধু জমিদার ক্যা? এই সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহ, তারে ইংরেজদের চোখের কাঁটাও করে তোলে। তাঁরা মনে করতে থাকে, আলাকুতি বিবি এইভাবে মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে থাকলে, সে সহজেই বিপ্লবীদের নজরে আইবো। আর এই ছোড বিদ্রোহ, স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ লইব। তাই তারে শেষ করা জরুরী।"

"কিন্তু এমনি এমনি কীভাবে? হাওর অঞ্চলের মানুষেরা সহজ সরল মানুষ। কিন্তু তাঁরা যাকে ভালবাসে, তারে প্রাণ দিয়া ভালোবাসে। আলাকুতি বিবির হাওর অঞ্চলে যা প্রভাব, তাতে তারে গুলি কইরা মারলে, বা গুম খুন করলে, লোকেরা ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ করবো। বরং, এমন এক পরিকল্পনা করতে হইব, যাতে তারই প্রিয় লোকেরা, বাদনাম করে তারে নিজের হাতে খুন করে। আর সেইমতই, তাঁরা এক ভয়ঙ্কর চক্রান্ত পরিকল্পনা করে।"

"তারপর? তারপর কী ওইল?" ঈষিকা কথাটা বলেই একটা ঢোক গিলল।

"এর মাঝে আলিকুতি বিবি কয়েকদিনের জন্য কোনো এক পীরবাবারে দেখতে বাইরে গেলো। ওই সময়ই ইংরেজ আর জমিদারের লোকেরা হাওর থেকে বাচ্চাদের অপহরণ কইরা তাগো মাইরা, হাড়গোড়, কাপড় জামার টুকরো সব পুঁইত্যা ফালাইলো, অনুপস্থিত বিবি মার বাড়ি মেঝেতে। এদিকে আবার জমিদারের চরেরা, গ্রামে গ্রামে রটাইতে লাগলো, বিবি মার যাওয়ার লগে লগেই এই সব শুরু হইল। সে আসলেই ডাইনি। সে বাচ্চাদের মন্ত্র বশীকরণ কইরা অপহরণ করসে। সে, ভালো কাজ করবার টাহা নিত না, কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ডাইনিরা তো, বাচ্চাদের ঘ্রাণ বেশি পছন্দ করে, তাই।

"প্রথমে কেউ বিশ্বাস না করে নাই, এই কথা। পরে যহন, তার বাড়ির মেঝে খুঁড়ে এইসব জিনিসপত্র বারাইলো, তহন সকলেরই চক্ষু চড়কগাছ। তার মানে সত্যি সত্যিই আলাকুতি বিবি ডাইনি? এর মধ্যে, বিবি মা পীরের দর্শন সেরে ফিরে আইলে, জনগণের রোষ পড়ে তার উপর। বিবি যত বোঝাল সে নির্দোষ, কেউই তার কথা বিশ্বাস করল না। উল্টে এতদিনে করা, তার ভালো কাজগুলোরে ভুইল্যা যাইয়া লগে লগে তাকে, ডাইনি অপবাদ দিয়ে দিলো। আর একদিনের মধ্যে, তারে, হাওরের ত্রিসীমানার বাইরে চলে যাইতে নির্দেশ দিলো। কিন্তু এতে কইরা, তো বিবি মার প্রাণে বাইচ্যা যাওনের সম্ভাবনা আসে। কিন্তু জমিদারের তো তা হইতে দিলে চলব না। শত্রুর যে শেষ রাখতে নাই।"

" ওই রাতেই আরেক শিশুরে চুরি কইরা, মাইরা, তারে আলাকুতি বিবির ডিঙির মদ্যে লুকায়ে ফেলাইলো জমিদারের লোকেরা। পরে যহন খোঁজ শুরু হইল, নিখুঁত পরিকল্পনায়, তারে খুঁজে পাওয়া গেল, বিবির ডিঙির মদ্যে। ব্যাস! জনগণরে আর পায় কে? ডাইনি খেপেছে। ওরে জানে না মারলে, ও হাওরের সকল শিশুরে খাইয়া ফেলাইবো। কথাডা দাবানলের মত ছড়াইলো। লোকেরা হাতের সামনে যে যা পারলো তুলে লইল।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? তার নিজের লোকেরাই আলাকুতি বিবি কে মারতে মারতে, হাত, পা, নাক, মুখ বাইধ্যা, মাছের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া, হাওরের জলের কোন এক জেগায় ফেলায় আইলো। শোনা যায় নাকি আলাকুতি বিবির শেষ কথা আসিল, যারা তারে ভুল বুঝে দূরে ঠেইলা দিলো, তাঁদের নাকি সে নিজের কাছে নিয়ে আনব..."

একটানা কথা বলে থামলেন বন্ধন সাহেব। হাঁপাচ্ছেন। ঘরের মধ্যে একটা পিন পতন নিস্তব্ধতা। "ইশ! কী কষ্ট রে! যাদের লিগাই সব করল, তাঁরাই, তারে খুন করল ভুল বুঝে?" ঈষিকা নামের মেয়েটির গলা থেকে ভয়টা উবে গিয়ে, কেমন জানি একটা কষ্টের অনুভূতি টের পেল।

"হ্যাঁ, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের কী? আমরা কেন এখানে আসবো? আমাদের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?" শতিভুর প্রশ্নে, বন্ধন সাহেব, মুখ তুলে হাসলেন। "সে হাওরের মানুষদের চিনতো। তাঁদের জানতো। হাওরে আগে তো বাইরের মানুষ আইতো না। এহন আহে। কিন্তু সে সেই হিসেব বুঝব ক্যান? হাওরে নামা প্রত্যেকটা মানুষকে সে শেষ করতে চায়। হয়তো এইডাই তার বদলা।"

মাসুদ মিয়াঁ গল্পটা জানতো, কিন্তু ভিতরে এত কিছু ছিল তার জানা ছিল না। সে তন্ময় হয়ে পুরো ঘটনাটা শুনছিল। আচমকা একটা ছলাৎ শব্দে চমকে উঠল সে। অনেক ক্ষীণ কিন্তু এই শব্দ তার চেনা, নৌকোতে ঢেউএর ধাক্কা লাগলে এমন শব্দ তৈরী হয়। মাসুদ দেরী না করে, দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। দরজার বাইরে, কাঠের রেলিং ঘেরা এক চিলতে বারান্দা। এখান থেকেই মূলত যাত্রীরা, ময়নামুখীতে ওঠে। হাতের টর্চের উজ্জ্বল আলো এই মুহূর্তে মরা হাওরের স্থির জলের উপর নিবদ্ধ। পুকুরের জলের উপড়ে ঢিল ছুড়লে, যেমন কেন্দ্র থেকে ছোট ছোট তরঙ্গ, সারা পুকুরে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনই ছোট ছোট জল তরঙ্গ অন্ধকার হতে, ক্রমশ এগিয়ে এসে ময়না মুখীতে ধাক্কা মারছে। এই ভাবে তো তরঙ্গ তৈরী হয়, কেউ জলের উপর ঢিল ছুঁড়লে। অথবা... কেউ জলের উপর দিয়ে হেঁটে আসলে।

সাথে সাথে একটা তীব্র শিসের শব্দ। ঠিক শিস না, আগেকার দিনে নৌকা, ফেরী ছাড়ার সময় ব্যবহৃত হত, এক বিশেষ ধরনের বাঁশি। সেই সঙ্গে একটা তীব্র আঁশটে গন্ধ। শব্দটা অন্ধকার থেকে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু কেউকে দেখা যাচ্ছে না। আচমকা মাসুদের হাতের টর্চের আলোটা দপ করে নিভে গেলো। একই সঙ্গে সেই আগের মত, ময়ান্মুখীর সব কটি আলোই দপ দপ করে উঠল।মাসুদ ভয় পেয়ে, ভেতরে ছুটে আসতেই, রিপন তাকে জড়িয়ে ধরলো। "চাচা, বাড়ি যামু। বাড়ি লইয়া চলো আমারে।"

মাসুদ কী বলবে? একটা ভয় তার গলার কাছে দলা বেঁধে আছে। ঠিক এমন সময় দুলা, চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই, সেই চেনা আতঙ্ক আবার ফিরে এলো। সকলে দেখল, দুলা ভয় পেয়ে

দেওয়ালে, কেমন যেন সেঁটে গিয়েছে। ভয়ার্ত কান্নার মাঝেই তার দুই চোখ, একবার দোতলার সিঁড়ির দিকে, আর একবার প্রবেশের দরজার দিকে বারবার ঘুরছে।
মাসুদ, বন্ধন সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "এ কীহের শব্দ? কীহের ইঙ্গিত? তার আসার নাকি?"
বন্ধন সাহেব দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন, "উঁহু তার প্রথম শিকারের। সে তার প্রথম শিকার বাইছা লইসে।"
আর ঠিক তারপরেই মাথার ওপর, দপদপ করতে থাকা আলোটা ঝুপ করে নিভে, চতুর্দিক পুনরায় আগের মত অন্ধকার হয়ে উঠল।

৩) সর্পের ভুতঃ

ঝুমুর কেবিনের দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখের দৃষ্টি বিছানায় শুয়ে থাকা সায়নীর অচৈতন্য শরীরের উপর নিবন্ধ। গায়ের ওপর, একাধিক মোটা চাদর চাপাতে, কাঁপুনিটা বন্ধ হয়েছে সায়নীর। কিন্তু জ্বরটা যে কমছে না। হুট করে যে কী হয়ে গেল? সায়নীকে সেই পাঠিয়েছিল দোতলাতে। ভেবেছিল স্কার্ফ বয়া ওড়না নিয়ে ফিরে আসবে হয়তো। কিন্তু শত আর প্রতি দা নেমে এলেও সে নামে নি। ওই সময় কোথায় গিয়েছিল সে? ইশ! তার নিজেরই রিপেন্ট হচ্ছে, কেন যে সে নিজে গেল না ওর সঙ্গে। আচ্ছা, সায়নিই কী সেই মানুষ, যে নাকে ঢাকা দেয় নি। আর তাই ওই আলাকুতি বিবি ওদের পিছু নিয়েছে। একটু আগেই যা হল? সেটাই বা কী? একটা অদ্ভুত আতঙ্ক চেপে বসছে তার বুকের মধ্যে। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে সময়টা দেখল সে। বাড়িতে ফোন করবার অনেকবার চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু নেটওয়ার্ক পুরো এমারজেন্সির আওতায়। কী করবে এখন সে? নীচে যাবে একবার? কিন্তু বাইরের করিডোরেও বেরোতে ভয় করছে এই মুহূর্তে। শত দা সেই যে একটা কম্বল আনতে নীচে গেল। কই এখনো তো এলো না? বাইরে বেরিয়ে ডাকবে একবার? কিন্তু এই মুহূর্তে কী কোন শব্দ করা উচিত হবে? কিন্তু তার যে একবার ওয়াশরুমে যাওয়া দরকার।

এসবই ভাবছিল সে অন্যমনস্ক হয়ে। আচমকা, কেবিনের আলোটা দপদপ করে উঠতেই ঝুমুর কী মনে করে, সায়নীর দিকে তাকাতেই, মুহূর্তের জন্য বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল তার। সায়নী বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ইতিমধ্যেই মেয়েটা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। ঝুমুর এগিয়ে এসে, সায়নীর কপালে, হাত ছোঁয়াতেই, সায়নীর ঠোঁটটা বেঁকিয়ে, একটা অদ্ভুত, নিঃশব্দ হাসি হাসল। জ্বর তো আছে। কিন্তু সায়নী এরকম ক্রিপি হাসি হাসছ কেন? ভালো লাগছে না তার মোটেও। শত দা নীচে এতক্ষণ কী করছে সে দ্রুত, হাত টা সরিয়ে বলে উঠল, "তুমি একটু থাকো। আমি একটু ওয়াশরুম থেকে ঘুরে আসছি।"

সায়নী কিছু না বলে, সেই একই ভাবে, তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঝুমুর দেরী না করে, দ্রুত ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো। তারপর বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলো। এই জায়গা, একটু আগে ঘটা সেই ভয়ঙ্কর জিনিস, এই বোট আর সায়নীর এই অদ্ভুত বিহেভিয়ার। সব কিছু মিলিয়ে, জিনিসগুলো তার জন্য যথেষ্ট ভয় পাওয়ানোর মত। সে নিজে যথেষ্ট নার্ভ শক্ত ওয়ালা মেয়ে। কিন্তু এগুলো নেওয়া যাচ্ছে না। সে এখন মরিয়া হয়ে বাড়ি ফিরতে চায়।

বাথরুমে একটা ছোট্ট বেসিন। বেসিনের মাথার উপরেই একটা ছোট্ট আয়না লাগানো। সায়নী আয়নার দিকে তাকিয়ে এসবই ভাবছিল। আচমকা, ফের মাথার উপর আলোটা দপদপ করে উঠল, আগের মত। ইঞ্জিন বন্ধ আছে বলেই, কী এরকম আলোর গোলমাল হচ্ছে? নাকি...

কথাটা বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না। কারণ ততক্ষণে, তার কানে এসে গিয়েছে একটা ফিসফিসে স্বর। কেউ যেন কথা বলছে, খুব কাছে দাঁড়িয়েই। কিন্তু কোথায়? কেউ নেই তো...ঠিক এমন সময় তার চোখ পড়ল, বেসিনের ফুটোর দিকে। হ্যাঁ, ওখান থেকেই আসছে সেই ফিসফিসে স্বর। শুনলে মনে হবে, কেউ যেন এক নাগাড়ে, আউড়ে চলছে কতগুলো শব্দ। ঝুমুর ধীরে ধীরে কানটাকে

বেসিনের সামনে নিয়ে আসতেই, কী একটা হল যেন। ঝুমুরের মনে হল কেউ যেন তার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠছে,
"হাওরের হাওয়া... হাওরের পানি
আলাকুতি বিবি... হাওরের রানি..."
ছিটকে উঠে দাঁড়ালো ঝুমুর, আর উঠে দাঁড়াতেই গলার ভেতর থেকে, একটা আর্তনাদ ছিটকে উঠল তার গলার ভিতর থেকে আয়নায় এ কাকে দেখছে সে? এ তো সে নয়। এ তো সায়নি। ঘাড় বেঁকিয়ে, তার দিকে তাকিয়ে, সেই একই হাসি হাসছে। হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। না পালাতে হবে... ওরা কোথায় নীচের তলায়... ঝুমুরের মনে হচ্ছে তার সারা শরীর ভারী হয়ে উঠেছে। করিডোর দিয়ে চাইলেও সে ছুটে এগোতে পারছে না। চিৎকার করে ডাকবে কেউকে, সেটাও পারছে না। মাথাটা টলছে যেন। সে তারপরেও নিজের শরীরটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আচমকা, তার তার মনে হল, কেউ যেন তার পা জোড়া মাটিতে টেনে গেঁথে দিয়েছে।
ঠিক তার সামনেই, করিডোরের মাঝ বরাবর যেখানে আলোটা রয়েছে ঠিক তার নীচে সায়নী দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু অদ্ভুত ভাবে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে। ঠোঁটের কোলে সেই আগের অদ্ভুত হাসিটা। শরীরটা কী তার একটু বেশিই লম্বা লাগছে? মাথার উপরের আলোটা দপদপ করছে। ঝুমুরের মনে হল, তার গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। সে কথা বলতে পারছে না। তারপরেও কোন রকমে, শরীরের সমস্ত শক্তি জোগাড় করে বলে উঠল,
"সা... সায়নী! ও... ওখানে কী করছ? চ লো... ভে ভে ভেতরে চ..." কথাটা শেষ করতে পারলো না সে। তার আগেই তার চোখ পড়ল সায়নীর পায়ের কাছে পড়ে থাকা কালো ছায়ার উপর। কালো ছায়াটা থেকে খুব ধীরে ধীরে একটা কালো শরীর উঠে দাঁড়িয়েছে। ঠিক যেন মেঝে ফুঁড়ে। লম্বা কালো শরীর। মাথার লম্বা কালো চুল প্রায় মেঝে ছুঁয়ে ফেলছে যেন। চোখ মুখ বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু হাঁটুর নীচে ঝুলতে থাকা, হাতের তীক্ষ্ণ নখর এতো দুর থেকেও স্পষ্ট। কালো শরীরটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ঝুমুরের দিকে। আর ঝুমুর? সে কী করছে? সে কী পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকবে? একটা তীব্র শিসের শব্দ খুব কাছেই যেন বেজে উঠল, আর সেই সঙ্গে বাতাস ভারী করে তোলা, মাছের বিশ্রী আঁশটে গন্ধ। ঝুমুরের মনে হচ্ছে, এই গন্ধ, এই শব্দ আর এই ছায়া শরীর সব কিছুর উপস্থিতি তাকে যেন পাথর করে দিয়েছে। এগুলো কী সত্যি? না কী সে স্বপ্ন দেখছে? বুঝতে পারছে না সে কী করবে সে পালাবে? তাকে পালিয়ে বাঁচতেই হবে। হ্যাঁ, সে পালাবে। কথাটা ভাবতে ভাবতেই সে যেই পিছন ঘুরল সাথে সাথে দেখল, একেবারে তার মুখের সামনের দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই ভয়ঙ্কর ছায়া মূর্তি। পরের মুহূর্তেই, ঝপ করে আলোটা নিভে পুরো বোটটা ডুবে গেল অন্ধকারে। আর ঠিক তারপরেই ঝুমুর টের পেল কে যেন, কানের ঠিক পিছন দিকে ফিসফিস করে বলে উঠল,
"হাওরের হাওয়া... হাওরের পানি
আলাকুতি বিবি...হাওরের রানি"
****

আলোটা বন্ধ হয়ে যেতেই আবার একটা সম্মিলিত চাপা আর্তনাদ উঠলো ময়নামুখীর ভেতরে। আগত আতঙ্কে, সকলেই যখন মরিয়া তখন বন্ধন সাহেব চিৎকার করে উঠলেন, "বাঁচতে চাইলে।

কেউ কোন কথা কইয়েন না। একটাও না। সে যেন কোনো আওয়াজ না পায়।"
তার গম্ভীর স্বর বোটঘরে ছড়িয়ে পড়তেই, মুহূর্তেই নীরবতা নেমে এলো সেখানে। প্রতিভাস ততক্ষণে, পকেট থেকে একটা লাইটার বের করে, আলোটা জ্বালাতেই একটা অনুজ্জ্বল শিখা ছড়িয়ে পড়ল। বন্ধন সাহেব ঠোঁটে আঙুল দিয়ে, সকলকে চুপ করে থাকতে বললেন। ওদিকে মাসুদ, হাতে টর্চ খানা ঝাঁকাচ্ছে ভয়ঙ্কর ভাবে। কিন্তু না, কোন উন্নতি নেই। কী করবে তাঁরা এখন? এইভাবে কতক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে তাঁরা। ঠিক এমন সময় আচমকা মাসুদের টর্চের আলোটা ফের দপ করে জ্বলে উঠতেই, ঘরের মধ্যে, উজ্জ্বল সাদা বৃত্তাকার আলো ছড়িয়ে পড়ল। মাসুদ সকলের পানে টর্চের আলোটা মেরে দেখে নিলো সকলে ঠিক আছে কিনা। আর ঠিক তখনই, সিঁড়িতে আবার মচ মচ শব্দ।
কেউ একটা নামছে সিঁড়ি দিয়ে। কে? সায়নী নাকি ঝুমুর? ইশ! ওরা দুজন যে উপরে ছিল, সেটা একদম মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল শতিভুর। শতিভু সিঁড়ির মুখের দিকে এগিয়ে যেতেই আচমকা বন্ধন সাহেব হাতের ইশারায় তাকে থামতে বললেন। টর্চের উজ্জ্বল আলোটা, একবারে সিঁড়ির মুখে গিয়ে পড়ছে।
সায়নী!কাপড়ের পুটুলির মত কী একটা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। কিন্তু এ কী অবস্থা হয়েছে তার? শতিভু বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। সারা শরীর র ক্তে মাখামাখি পুরো। আর শুধু কী তাই, এই কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীর শুকিয়ে যেন কাঠ হয়েগিয়েছে। গাল বসে চোয়াল দেখা দিয়েছে। বাসি মড়ার মত ঘোলাটে চোখের মণি জোড়া। আর সেই চোখ জোড়াও যেন ঢুকে গিয়েছে, কালো কোটরের। হাতে করে যেই কাপড়ের পুটুলিটা ধরে রেখেছে এই মুহূর্তে, সেটা র ক্তে ভিজে সপসপ করছে। সায়নী কি চোখে দেখতে পাচ্ছে না? নাহলে অমন বাতাসে নাক উঁচিয়ে কীসের গন্ধ শুঁকছে সে? মানুষের?
"সায়নী? সায়নী কী হয়েছে তোমার?" শতিভু বন্ধন সাহেবের নিষেধ না শুনে, কথা বলে উঠতেই, সাথে সাথে সে ঘুরে দাঁড়ালো শতিভুর দিকে। বন্ধন সাহেব হাতের ইশারা করে থামতে লাগলেন, কিন্তু শতিভু যেন থামার কোন লক্ষণ নেই।
"তোমার হাতে ওটা কী সায়নী? কী রয়েছে ওটা?"
সায়নী এতক্ষণ পরে মুখ খুললো, "এটা? এটা হাওরের রাণীর দেওয়া উপহার..." কথাটা বলতে বলতেই, হাতের কাপড়ের পুঁটুলিটা খুলে সামনের দিকে মেলে ধরতেই, কী যেন, ঝড় ঝড় করে কাঠের মেঝেতে পড়ে চারিদিকে গড়িয়ে গেল। মাসুদের হাতের টর্চের আলো থরথর করে কাঁপছে। মানুষের হাড় আর একটা গলার নীচ থেকে কা টা মুণ্ডু। র ক্ত, মাংস, রসে মাখামখি। কেউ যেন খুব অযত্ন করে, হাড় গুলো থেকে মাং স বেছে খে য়েছে। কিন্তু সকলের দৃষ্টি এই মুহূর্তে সেই মুণ্ডুর দিকে। চোখ দুটো উ পড়ে নিলেও, হা হয়ে যাওয়া সেই মুখ চিনতে কারোরই অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।
"ঝুমুর!" রঙ্গনের আর্তনাদ করে উঠতেই। সাথে সাথে সেখানে একটা মরণ আর্তনাদের রোল উঠল। বন্ধন সাহেবের নিষেধ মুহূর্তেই ভুলে গেলো সবাই। আর তারপরেই যা হল, তা কল্পনার বাইরে। আচমকা, সায়নীর শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল যেন। তারপর সামনে পিছনে ঝাঁকুনি দিতে দিতে, শরীরটা একটু একটু করে মেঝেতে থেকে, উঠে শূন্যে ভাসতে লাগলো। অন্ধকার ঘরের

মধ্যে, মাসুদের টর্চের আলো এই মুহূর্তে শূন্যে ভাসমান, সায়নীর শরীরের উপর নিবদ্ধ। সকলে আতঙ্ক বিহ্বল দৃষ্টিতে সায়নীকে দেখছে। যা দেখছে তা কী সত্যি? নাকি?
বাতাস ভারী করে তোলা সেই বিশ্রী আঁশটে গন্ধের মধ্যেই আচমকা, সায়নীর মুখটা হাঁ হয়ে গেলো। আর সেই হাঁ টা একটু একটু করে, বড় হতে হতে লাগলো। এতো বড় হতে লাগলো যে, ওর চো য়ালটা ছিঁ ড়ে, সেটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যেতে লাগলো। সে এক নারকীয় দৃশ্য! ওরা দেখল, সায়নীর সেই বড় হাঁ এর ভেতর থেকে সবার প্রথমে বেরিয়ে এলো একজোড়া কালো হাত।।তারপর একটা মাথা, তারপর একটু একটু করে, পুরো শরীরটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো, সায়নীর শরীরটা, দুটো টুকরো হয়ে কাঠের মেঝেতে খসে পড়ল। আর সায়নীর জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল একটা ভয়ঙ্কর কালো শরীর। লম্বা, কালো কুচকুচে। দিঘল সরু হাত পা। কিন্তু হাতে তীক্ষ্ণ নখ। কালো চুলে মুখের সামনেটা ঢাকা। তাই চেহারা দেখা যায়না। কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময়, আচমকা সেই শরীরটা বদলে গেল ঝুমুরের চেহারায়। ঠিক যেন ভোজবাজির মত। একটু আগে যেখানে সায়নি ছিল সেখানে এখন ঝুমুর। চেহারা বদলে ফেলেছে এমনভাবে যে দেখে বোঝার উপায় নেই এটা, ঝুমুর না অন্যকেউ...
জিনিসটা আচমকা, মেঝেতে নেমে দাঁড়ালো। ঠিক যেখানে সায়নীর দেহ, দুটো টুকরো হয়ে পড়ে আছে তার উপরে। জিনিসটা ঘাড় ঘুরিয়ে সকলের দিকে একবার তাকালো। আর ঠিক তখনই তার ঘাড় আটকে গেলো রিপনের দিকে তাকিয়ে। রিপন, একপাশে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। ঠিক তখনই আবার সেই তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে জিনিসটা ধেয়ে গেলো রিপনের দিকে, কিন্তু তাকে স্পর্শ করবার আগেই একটা বজ্র কণ্ঠ গর্জে উঠল ঘরের ভিতর।
টর্চের আলোয় দেখা গেলো, বন্ধন সাহেব একটা লকেটের মত জিনিস, হাতে ঝুলিয়ে চিৎকার করে কী একটা যেন আউড়ে চলেছেন। আর খুব ধীরে ধীরে তার দিকে এগোচ্ছেন। একটা অন্য ভাষা। সেই ভাষা বোঝা যায় না। লকেট বলতে একটা সবুজ রঙের ছোট্ট পাথর। কিন্তু, কী অলৌকিক ভাবে সেই পাথর থেকে এই মুহূর্তে, সবুজ রঙের এক শীতল জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। শুধু নির্গতই হচ্ছে না বরং ছড়িয়ে পড়ছে কোণে কোণে।
একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো ঝুমুর রুপি ভয়ঙ্করীর গলার ভেতর থেকে। সেই চিৎকারে, মিশে ছিল, রাগ। গর্জন। আর তীব্র আক্রোশ। পরক্ষনেই জিনিসটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে বদলে গিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।
একটু আগে যা হল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। সকলেই অবাক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো বন্ধন সাহেবকে। কে এই ব্যক্তি? এ তো কোন সাধারণ মানুষ নয়। তাহলে?
কিন্তু সকলের কৌতূহল কে পাত্তা না দিয়ে, বন্ধন সাহেব পা পা করে এগিয়ে গেলেন সায়নীর ছিন্ন ভিন্ন হওয়া দেহের কাছে। তারপর বিড়বিড় করে কী যেন একটা বলে উঠলেন।
"জানাব? কী হইসে?"
মাসুদ বিড়বিড় করে কথাটা বলে উঠতেই বন্ধন বাবু ভ্রুকুটি সহ ফিরলেন তার দিকে, "আলাকুতি বিবি কহনই সেই ব্যক্তিকে প্রথম দিকে মারে না, যে প্রথম তার গন্ধ পায়। তাকে মারে শেষে। "
"মানে?"
"মানে এই মেয়েডি নয়। আলো যখন নিভে গেসিলো, এই আমাগো মধ্যে কেউই নাকের বাঁধন খুইলা প্রথম তার গন্ধ নিসিলো। আর সে সেটা ইচ্ছা কইরা করসিলো। কিন্তু ক্যান?"

পর্ব চার

১) আরেকজন যাত্রী

“মানে আপনি বলতে চাইছেন, সায়নীই সেই মানুষ নয়, যে প্রথম গন্ধ পেয়েছে। তাই তো? তারমানে এখানে কেউ আছে? যে নিজের নাকের বাঁধন খুলে আমাদের এই বিপদে ফেলেছে?” সায়নীর ছিন্ন ভিন্ন দেহের দিকে তাকিয়ে গলাটা ধরে এলো শতিভুর। সায়নীকে সে ভালোবাসতো না কখনই। কোনদিনও ভালবাসতে পারেনি। কিন্তু তারপরেও, একটা টান তো ছিলই। পারিবারিক সূত্রে মেয়েটাকে ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছে সে। মেয়েটাকে, সেই এই বাংলাদেশের ট্রিপে নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল, এই ট্যুরে এসেই, তার ভেতরের কথাটা, যা সে এতদিন লুকিয়ে এসেছিল, তা সে জানিয়ে দেবে কোনো এক নির্জন মুহূর্তে। জানিয়ে দেবে, যে সে প্রতিভাস কে ভালোবাসে। তার সঙ্গেই থাকতে চায়।
“হ, আমগো মদ্যাই সে রইসে। হ্যা এডা করসে, আমগো বিপদে ফেলানোর লগে । কিন্তু ক্যান করসে, আমার জানা নাই। আলাকুতিকে ডাইকাই তার কী লাভ?”
“আচ্ছা, আপনার হাতে ওইটা কী? আর ওই জিনিসটা কী চলে গিয়েছে ওখান থেকে?” প্রতিভাসের ইঙ্গিত ছিল বন্ধন সাহেবের হাতে ধরা সেই সবুজ পাথরের লকেট। “আর আপনি করেন টা কী? আপনি কী তান্ত্রিক বা ঝাড়ফুঁক করেন এমন কেউ?”
“ এহন আমি কী করি সেইডা জানা এতোটাও জরুরী নয়। শুধু এটুক কইতে পারি, আমি মহান আল্লাহর একজন সন্তান মাত্র। যা কিছু দেখলেন, আমার যা কিছু শেখা, তারে ভালবেসেই। আর এই লকেটটা হইল, সুরইয়া তাবুসি। এক উচ্চ পর্যায়ের পীরবাবার শোধন করা মন্ত্রপোড়া পাথর। হ্যায় থাকলে, কুনো খারাপ কিছু আমাদের ক্ষতি করতে পারব না।“
“আচ্ছা, অই জিনিসটা কী ম ইরা গেসে?” ঈষিকা ভয় পেয়ে বীথিকে এখনো আঁকড়ে ধরে রেখেছে।
“না। লুকায়ে গেসে মাত্র। সঠিক মুহূর্তের অপেক্ষায় ঘাপটি মাইরা রইসে কোথাও? এই যে দেহেন, এই পাথর হইতে, এহনো কেমন সবুজ জ্যোতি বেরইতেসে। সে আশাপাশেই রইসে।”
“আপনি দেখলেন, জিনিসটা কেমন করে, ঝুমুরের রূপে নিজেকে বদলে নিলো?
রঙ্গন এতক্ষণ পাথরের মত বসেছিল একপাশে। চোখের দৃষ্টি ঝুমুরের হাঁ হয়ে যাওয়া কাঁ টা মুণ্ডুর দিকে নি বন্ধ। তার ইচ্ছে ছিল, এই ট্রিপের পরে, সে ঝুমুরকে নিজের মনের কথা জানাবে। কিন্তু কী থেকে কী হয়ে গেল? একটু আগেই সে যা দেখল, তাতে, মাথার ভেতরটা এখনো ফাঁকা হয়ে আছে।
“হ্যাঁ, তাই তো দেখসি। ও যে কোন রূপ বদলাইতে পারে। সেইডাই তো ভয় হইতেসে। অ কহন কার রূপ ধইরা হাজির হইয়া যায়... আমাগো সতর্ক থাকতে হইব।“
“আচ্ছা, একটা খতা কইয়েন, একটু আগেই যা কইলেন, তাতে তো মনে হইল, আলাকুতি বিবি অনেক ভালা মানুষ আসিল। সে এমন মানুষ মারতেসে ক্যান?” পরিতোষ বাবুর প্রশ্নে, বন্ধন সাহেব

মাথা নাড়ালেন, "সঠিক কারণ জানা নাই। তবুও একটা কারণ আন্দাজ করতে পারুম। হাওরে কিন্তু ফি বছর, প্রচুর মানুষ জলে ডুবে মা রা যায়। সেইগুলা কিন্তু আসলেই দুর্ঘটনা। তয় আলাকুতি বিবিরে খু ন করা হইসিলো। আমার সন্দেহ যদি ভুল না হয়, এই একটিই কারণ, তার হিংস্র হওয়ার পিসনে। যাদের বিশ্বাস করসিলো। এত কিছু করসিলো। তাঁরাই তারে খু ন করসে। আসলে মানুষের মত বেইমান কেউ হয় না।"
"কোই যান আপনি?" আচমকা, এক মহিলার প্রশ্নে উপস্থিত সকলে, বোটের ডানদিকে তাকালো। মহাসীন সাহেব এতক্ষণ ভয় পেয়ে মেঝেতে বসেছিলেন, আচমকা উঠে দাঁড়াতেই তার সেই স্ত্রী ভয় পাওয়া স্বরে প্রশ্নটা করল।
"সে কৈফিয়ত, তোমারে দিমু নাকি?"
"বলেন না, কই যান?"
"বাথরুমে, যাই। যাবি আমার লগে?" কথাটা বলেই তিনি বাকীদের দিকে তাকালেন, "এই হাড় গোড় আর ম ড়া দেখতে ভাল্লাগে না।"
এই কথাটা শুনে, মেয়েটি আচমকা তার হাত চেপে ধরল। "শোনেন, যাইয়েন না। অই যে, উনি কইতেসেন, সে লুকায়ে আসে, আড়ালে। সকলেই এইহানে আসে। আপনি একটু চাইপ্যা চুইপ্যা থাহেন কষ্ট কইরা। দোহাই আপনারে, যাইয়েন না। আমার ডর লাগে।"
সাথে সাথে সপাটে মহাসীন সাহেব, সপাটে একটা বাঁ হাতের চড় মারলেন তার স্ত্রীর গালে। রোগা পাতলা মেয়েটি একপাশে কঁকিয়ে উঠে ছিটকে পড়ল। "অত, পিরিত মারানোর লাগব না। তর হাওর ঘুরনের সখ ছিল না মাগী? আজ তর জন্যই এইহানে আমি আটকা পড়সি।"
"এসব কী করছেন আপনি?" শতিভু চিৎকার করে উঠল, "নিজের স্ত্রীর গায়ে সকলের সামনে হাত তুলছেন? টাকা ইনকাম করছেন বলে কী সকলের মাথা কিনে নিয়েছেন?"
পরিতোষ বাবুর স্ত্রী, আর ঈষিকা তাকে মাটি থেকে টেনে তুলেছে। "আজ তোর জন্য আমায় এখানে ফাঁসতে হইল। তুই বাড়ি চ।" আর তারপরেই সে ফিরলেন শতিভুর দিকে, "বিদেশি মানুষ নিজের সীমার মধ্যে থাইকেন। আমার স্ত্রী আমি মারি কাটি সেটা আমার প্রব্লেম। আপনার কী?" কথাটা বলেই তিনি বাথরুমের দিকে যেই এগোতে যাবেন সাথে সাথে বন্ধন সাহেব পথ আটকে দাঁড়ালেন।
"কোই যান?"
"সে কৈফিয়ত কী আপনারে দেওয়া লাগবো?"
"হ্যাঁ, লাগব।"
"টয়লেটে যামু।"
বন্ধন সাহেব মাসুদকে একটা ইশারা করতেই, মাসুদ রিপনের হাতে টর্চলাইটটা ধরিয়ে, একটা হ্যারিকেন ধরিয়ে আনলো। বন্ধন সাহেব সেই, হ্যারিকেনটা মহাসিন সাহেবের দিকে বাড়িয়ে বলল, "এটা লইয়া যান। তবে একলা যাইয়েন না। কথাটা বলেই তিনি, প্রতিভাসের উদ্দেশ্যে, লকেটটা বাড়িয়ে বললেন, "আপনি একটু এইটা লইয়া ওনার সঙ্গে যাইবেন? দরজার বাইরে দাঁড়ালেই হইব।"
প্রতিভাস জিনিসটা নিয়ে মহাসিন সাহেবের পিছুপিছু বাথরুমের দিকে অগ্রসর হল।
"আপু আপনে ঠিক আসেন?"

অল্পবয়সী মেয়েটা নিজেকে না সামলাতে পেরে, ঈষিকাকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ঈষিকারও চোখে জল
"আপু, একটা কথা কই, রাগ কইরেন না।" ঈষিকার কণ্ঠে উষ্মা, "আপনার স্বামী, যতই টাকা ইনকাম কইরেন না কেন? তিনি মাইনসের পর্যায়ে পড়েন না। আপনি তারে ডিভোর্স দ্যান না ক্যান?"
মহিলাটি চোখের জল মুছে বলল, "ডিভোর্স দিয়া কই যামু আপা? গরীব এতিম মাইয়া আমি। বস্তিতে থাইক্যা লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাম করতাম। দেখতে শুনতে ভালো আসিলাম, তাই জামাই পছন্দ কইরা বিয়া কোরসে। থাকা খাওনের অভাব হয় না। ডিভোর্স দিলে এখন কই যামু?"
"তাই বইলা এইভাবে..."
ঈষিকার কথা মাঝপথেই থামিয়ে মাসুদ বলে উঠল, "এইহান থেকে কী কহনওই বেরন যাইব না? এইহানেই আমাদের মরণ। লোকে যে কয়, সত্য সত্যই কী কুনো উপায় নাই।"
টর্চের আলোয় বন্ধন সাহেবের মুখটা কেমন যেন পাথরের মত লাগছে। আচমকা তার চোখ পড়ল হুলার দিকে। হুলা, এই মুহূর্তে কাঠের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে তার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে।
"হুলা ফিরা, গেসিল? তাই না? ও কীভাবে ফিরসিল? ও তো মাথা পাগলা লোক, এই মরা হাওর থিকা ফিরল কী কইরা?"
কথাটা বলতে বলতেই বন্ধন সাহেবে হুলার হাত ধরে টেনে, তাকে ঘরের ঠিক মাঝখানে এনে দাঁড় করালেন। সকলের চোখের দৃষ্টি হুলার দিকে নিবন্ধ।
"আমায় দেখতে হইব এ ক্যামনে ফিরা গেসিলো।" কথাটা বলেই তিনি হুলার হুটো হাত মুঠোর মধ্যে ধরে, হুলার দিকে ফিরলেন, "হুলা, বাপ আমার... চোখ বন্ধ করতো বাপ আমার।"
"চোখ বন্ধ করমু... চোখ বন্ধ করমু।" কথাটা বিড়বিড় করে বলতে বলতেই, হুলা নিজের চোখ বন্ধ করল।
"আমি যতক্ষণ না চোখ খুলি কেউ আমাগো স্পর্শ কইরেন না।" কথাটা বলেই বন্ধনসাহেব, বিড়বিড় করে কী যেন একটা পাঠ করতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝেই হুলার গায়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। আচমকা টর্চের আলোটা দপদপ করে উঠতেই, বন্ধন সাহেব আর হুলা উভয়েই কেমন যেন কেঁপে উঠল ভয়ঙ্কর ভাবে। সে কাঁপুনি আর থামে না। কয়েকমুহূর্ত এইভাবে চলার পর, বন্ধন সাহেব চোখ খুলে, ছিটকে সরে এলো হুলার কাছ থেকে।
"কি হইল জানাব?" মাসুদ সহ উপস্থিত সকলেরই মুখে ভয় মিশ্রিত কৌতূহল। "কিছু কী দেখতি পাইলেন আপনি?"
"অন্ধকার রাত্রি। একটা ডিঙি। সেই ডিঙি এগিয়ে চলতেসে, মড়া হাওরের বুক চিরে। ডিঙির একদিকে বসে রয়েছে হুলা...কিন্তু"
"কিন্তু কী?"
"মিঁয়া, আপনি না বলতেসিলেন, একজনই ফিরে আসিল হাওর থিকা? সে হইল হুলা?"
"হ! ক্যান?"
"ডিঙিখান হুলা চালাইতেসিল না। চালাইতেসিল আরেকজন মানুষ।"
"মানে?"

“মানে, হাওর থিকা শুধু দুলা ফেরেনাই সেইরাত্রে। ওর সাথে ফিরসিল আরেকজন মানুষ। সে লোকের চোখে পড়বার আগেই নিজেরে লুকায়ে ফেলসিল। কিন্তু ক্যান? কী উদ্দেশ্য তার? অপয়া হইবার ভয়? নাকি অন্যকিছু?”
“এখন কী করবো আমরা?” শতিভুর গলায় ভয়।
“যা দেখতেসি আমরা, তার থিকাও জিনিসগুলো ভয়ঙ্কর। শুধু উপস্থিত সকলে শুইন্যা রাখেন, সে মা রার চেষ্টা করব আমাগো। হেডা তার এলাকা। এখানে তার অনুমতি ছাড়া পাতাও নড়ে না। হ্যায় যদি আমাগো সকলরে মাইরা ফেলায়, তাহলে, শেষ পর্যন্ত যে টিকা থাকবো, সে জ্যান আলাকুতির হাতে ধরা না পড়ে। তার থিকা নিজেরে শ্যা ষ করন দেওয়া ভালো। তবে সাবধান, মড়ার চোখে যদি একবার তার ছায়া পড়ে, তাহলে সর্বনাশ হইয়া যাইব।“
“কী ধরনের সর্বনাশ?”
“জানি না। শুধু জানি, সর্বনাশ হবে। সর্বনাশ।“

২) সবুজ পাথরঃ

হ্যারিকেনটা নিয়ে বাথরুমের ভেতরে ঢুকে দরজাটা লাগাতে যেতেই, আচমকা প্রতিভাস বাঁধা দিয়ে উঠল। "দরজাটা লাগানো বোধয় ঠিক হবে না।"
"মানে?"
"দরজাটা তো, একটা বাঁধা। দরজা লাগালে, পাথরের প্রভাব, বাথরুমের ভেতরে যদি কাজ না করে?"
মহাসিন সাহেব, দাঁতে দাঁত পিসে, বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "এই বেয়াদপি তুমি আমার বাড়িতে করতে, তাহলে তোমার জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলইতাম। নিজের সীমার মধ্যে থাকো ছোকরা।" কথাটা বলেই দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন তিনি।
প্রতিভাস এই পরিস্থিতেও, রীতিমত বিরক্ত এনার ব্যবহারে। ভালো কিছু বলবার উপায় নেই। চুলোয় যাক! কথাটা বলেই, হলঘরের দিকে এগিয়ে গেল সে।
বাথরুমটা খুব একটা বড় নয়। এই চার ফুটের বাই চার ফুটের। প্রবল বিরক্তিতে, মুখটা কুঁচকে গেল তার। ঠিক করে দাঁড়ানোও যাচ্ছে না এখানে। হ্যারিকেনটা একপাশে রেখে, টয়লেটের কাজকর্ম সারতে সারতেই, তার মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে উঠল। এ কাদের সঙ্গে এসে পড়ল সে। এটা একটা বোট? জঘন্য। কারা ওঠে এসবে? ফ্ল্যাশের নল ঠিক করে কাজ করে না, একটাও হ্যাঙ্গার নেই, সেই সঙ্গে বিশ্রী একটা গন্ধ। ক্লাসলেস! তখন, জিততেই হবে, এই মানসিকতা তাকে পাগল করে তুলেছিল। তাই কোনোকিছু বিচার না করে, এতোগুলো টাকা এক্সট্রা দিয়ে, এই ময়নামুখী হাউসবোট ভাড়া করেছিল। এখন মনে মনে আফসোস হচ্ছে। এতোগুলো টাকা এই নেমকহারামদের জন্য না ব্যয় করলেই ভালো হত। এরা তাকে চোখ রাঙ্গাচ্ছে? এত বড় সাহস!
ঠিক এমন সময়, বাথরুমের বিশ্রী গন্ধটা ছাপিয়ে একটা তীব্র আঁশটে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। আবার সেই গন্ধটা? তার মানে কী আলাকুতি বিবি আবার ফিরে এসেছে? মহাসিন সাহেব ভয় পেলেন। ছেলেটা বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে তো? ফিরতে হবে বাকীদের কাছে। তড়িঘড়ি নিজের কাজ সেরে, যেই হ্যারিকেনটা তুলতে যাবেন, ঠিক সেই সময়, মহাসীনবাবু টের পেলেন, একটা একটা করে, তার ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মহাসিন সাহেব সটান সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মাথার উপর থেকে একটা ফোঁসফোঁস শব্দ বেরিয়ে আসছে। কেউ যেন ঠিক তার মাথার উপরে প্রচণ্ড জোরে শ্বাস নিচ্ছে। এই বাথরুমের ভিতরে তিনি ছাড়াও আরেকজন রয়েছে?
তিনি হ্যারিকেনটা ধরে, যেই ঘাড় তুলে, উপরের দিকে তাকাতেই টের পেলেন, তার পেটের ভেতরটা একটু একটু করে খালি হয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড আতঙ্কে।
একটা শরীর ঠিক তার মাথার উপরে শূন্যে ভাসছে। কুচকুচে কালো চেহারা। লম্বা হাত পা গুলো জড়িয়ে পেঁচিয়ে কেমন একটা হয়ে রয়েছে। মুখের সামনে লম্বা চুলগুলো ঝুলছে। মহাসিনবাবু চোখ তুলে তাকাতেই, জিনিসটার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো হাসির শব্দ, খিক খিক খিক খিক। একটু আগেই এই চেহারা তিনি দেখেছেন একতলার হলরুমে। আলাকুতি বিবি! সে এখন তার সঙ্গেই, এই বাথরুমের ভেতরে। জিনিসটা খুব ধীরে ধীরে টিকটিকির মত দেওয়াল বেয়ে, তার আর দরজার মাঝখানে নেমে দাঁড়ালো।

ওই যে, সেই তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ আবার বেজে উঠেছে। যেন জাহাজের সাইরেন। এই শিসের শব্দ তার চেনা। হ্যারিকেনের হলুদ আলোটা, সেই ভয়ঙ্করীর কালো কুচকুচে চেহারার উপরে পড়ছে, যেটার সঙ্গে এই মুহূর্তে তার দূরত্ব দেড়ফুটেরও কম। মহাসিন সাহেবের মাথা কাজ করছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ, হাঁটু জোড়া ঠকঠক করে কাঁপছে তার। কী করবেন তিনি? একটা প্রচণ্ড আতঙ্ক গলার কাছে এসে দলা পাকিয়েছে। সাহায্যের জন্য আর্তিটুকুও বেরোচ্ছে না।
ঠিক এমন সময় সেই ভয়ঙ্করী ধীরে ধীরে, নিজের দুহাত দিয়ে, মুখের সামনের চুলটা সরাতেই হ্যারিকেনের আলোয় ফুটে উঠল তারমুখ। কিন্তু এটা কী? উফ কী ভয়ঙ্কর! আঁতকে উঠে, হাত থেকে হ্যারিকেনটা খসে পড়তেই মুহূর্তেই সেই আলো নিভে চারিদিকটা ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরে উঠল বাথরুমটা। কিন্তু ততক্ষণে, যা দেখার দেখে ফেলেছেন মহাসীন সাহেব। তারাবিহীন দুটো বড় বড় হলুদ রঙের চোখ। আর নাক ও মুখের জায়গায় একটা বড় কালো গহ্বর, যার ভিতরে থরে থরে গিজগিজ করছে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি।
আচমকাই কেউ তার কানের কাছে মুখ এনে, খুব টেনে টেনে বলে উঠল,
"হাওরের হাওয়া হাওরের পানি
আলাকুতি বিবি হাওরের রানি।"
আর ঠিক তারপরেই একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল গোটা বাথরুমে।
******
"কী হইল, আপনি চইলা আইলেন?" প্রতিভাস অত্যন্ত রাগের সঙ্গে লকেটটা বন্ধনবাবুর সামনে টেবিলের উপর রেখে বলল, "ওনার মত অসভ্য লোক আমি জীবনে দুটো দেখিনি। যেখানে আমি তাকে বাঁচাতে চেয়ে দরজাটা খোলা রাখতে বলেছিলাম, উনি কিনা আমায় যা নয় তাই বললেন?"
"ওনার একটু ট্যাহার অহংকার রয়েসে।" পরিতোষ বাবু কথাটা বলে উঠতেই, শতিভু কাঁধ ঝাঁকালো।
"একটু? ওটা একটু দেখলেন? উনি কী মনে করেন? ওনার একলার কাছেই টাকা আছে? ভালো মানুষ হতে গেলে ব্যবহার কাজে লাগে টাকা নয়। উনি এমন ভাব করছেন, যেন সকলকে উনি কিনে রেখেছেন।"
বন্ধন সাহেব মাথা নাড়ালেন, "হ্যাঁ, উনি মানুষ ঠিক না। কিন্তু তারপরেও ভাই, আপনি যান। আপনার ওনাকে ওইভাবে ফেলে আসা ঠিক..."
কথাটা শেষ হওয়ার আগেই থমকে গেলেন বন্ধন সাহেব। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে, আবার সেই তীব্র আঁশটে গন্ধ। তারমানে, হাওরের ত্রাস আবার ফিরে এসেছে? কিন্তু কিভাবে? আর কোথায়? আর ঠিক তারপরেই সেই শিসের শব্দ।
চিৎকার করে উঠলেন, মসাহিন সাহেবের স্ত্রী, "উনি ঠিক আসেন তো? এতক্ষণ বাথরুমে কী করতেসেন উনি? আমি যাব ওনার কাছে... আমায় যেতে..."
কথাটা শেষ হল না তার আগেই একটা তীব্র আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল পুরো হাউসবোটে। আর ঠিক তারপরেই সব চুপ। আঁতকে উঠল সকলে। শব্দটা এসেছে হলঘরের ডানপাশের প্যাসেজের দিক থেকে। ওইদিকেই একতলার বাথরুম...

মাসুদের হাত থেকে টর্চটা ছিনিয়েই বন্ধন সাহেব ছুটলেন সেইদিকে। তার পিছন পিছন বাকীরাও। সর্বনাশ! আবার একটা প্রচণ্ড খারাপ কিছুর ইঙ্গিতে সকলের মনই কু ডাকছে। প্রতিভাস নিজেও ভয় পেয়েছে। ইশ!সে যদি এইভাবে চলে না আসতো...
“মহাসিন সাহেব? মহাসিন সাহেব? দরজা খোলেন। দরজা খোলেন।“ বাথরুমের বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। মাসুদ ও ধাক্কা দিচ্ছে।
“আলম সাহেব? আলম সাহেব?” নাহ। দরজা খোলা তো দূরের কথা, ভিতর থেকে কোন সাড়াটুকুও নেই।
“কী হইব এহন?” আচমকা প্রশ্নটা করেই, ফোঁপাতে শুরু করলেন মহাসিন সাহেবের স্ত্রী।
“দরজা ভেঙে ফেলা ছাড়া আর উপায় দেখি না।“ রঙ্গন কথাটা বলেই শতিভুর দিকে তাকালো। শতিভু ইশারা বুঝে যেই রঙ্গনের সঙ্গে, দরজাটা ধাক্কানোর জন্য এগিয়ে গেলো, সেই মুহূর্তেই “কঁ্যাচ” একটা বিশ্রী শব্দ করে, খুলে গেলো, দরজাটা। বাথরুমের ভিতরটা অন্ধকার। মাসুদ তড়িঘড়ি উজ্জ্বল টর্চের আলোটা বাথরুমের ভেতরে জ্বালাতেই, একটা শীতল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল পুরো শরীর জুড়ে। পুরো বাথরুমটা, র ক্তে ভেসে যাচ্ছে যেন। চারিদিকে মাং স আর হাড়ের র টু করো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আর বথারুমের ঠিক মাঝ বরাবর বসানো রয়েছে, একটা ধড় থেকে উপড়ে নেওয়া কা টা মুণ্ডু। ঠিক ঝুমুরের মতই মহাসিন বাবুর হা হয়ে যাওয়া মুখটা দেখেও তাকে চিনতে অসুবিধে হয়নি কারোরই।
এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখে, মহিলারা ভয়ঙ্কর ভাবে আর্তনাদ করে উঠলেই, বন্ধনবাবু চাপা ধমক দিয়ে উঠলেন, “না, না। কোন শব্দ নয়। বাঁচতে চাইলে কোন শব্দ নয়। কোন শব্দ নয়।“ বন্ধনবাবুর ধমকে যেন আর্তনাদগুলো গিলে নিলো মেয়েগুলো। কিন্তু ওরা পাগলের মত কাঁপছে। এদিকের মাসুদের চোখ জোড়া, এখনো সেই কা টা মুণ্ডুর দিকে নিবদ্ধ। সে নিজে লোকটিকে পছন্দ করতো না। কিন্তু এই পরিণতি সে মানতে পারছে না। আচ্ছা, তাঁদের সকলেরই কী এক পরিণতি হবে? ভাবতে পারছে না কিছুতেই। তার কিছু হলে, তার মা মরা মেয়ে বিন্দির কী হবে? রিপনের গরীব বিধবা আম্মু যে তার ভরসায় রিপনকে ছেড়েছেন। সেই ছেলে কী কখনওই আর মায়ের কাছে ফিরতে পারবে?
ঠিক এমন সময়, হল রুমের দিক থেকে আরেকটা চিৎকার ভেসে এলো। দুলা! তার স্বরে চেঁচাচ্ছে। হায় ঈশ্বর এবার কী দুলার পালা তাহলে? বন্ধন সাহেব মাসুদের হাত থেকে টর্চটা ছিনিয়ে, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন হলঘরের দিকে।
টর্চের সাদা আলোটা, অন্ধকার হলঘরের বুক চিরে দুলার উপরে গিয়ে পড়ল।
ভয়ে কুঁকড়িয়ে, কাঁপতে কাঁপতে সে চিৎকার করছে। না, কিছু নেই তার সঙ্গে। কেউ তাকে আক্রমণও করেনি। কিন্তু তারপরেও তার গলার স্বরে মরণ আর্তনাদ।
মাসুদ গিয়ে ছুটে ধরল তাকে। “এই দুলা, কী হইসে? অমন কইরা চিৎকার করস ক্যান, চুপ! চুপ কর... কী হইসে?”
আচমকা, সে মাসুদ কে ধাক্কা মেরে সরিয়ে, হলঘরের অন্ধকার কোণের দিকে, অঙ্গুল উঁচিয়ে কী একটা নির্দেশ করতেই সাথে সাথে, বন্ধন বাবুর টর্চের উজ্জ্বল আলোটা ঘুরে গেলো সেই দিকে। হলঘরের দক্ষিণপশ্চিমের অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে, রিপন। প্রচণ্ডে আতঙ্কে, প্যান্টে প্রস্রাব ও করে ফেলেছে সে। কিন্তু ও তো ওখানে একলা নয়। ওটা কে ওর সঙ্গে? রিপনের

দুই কাঁধের উপর হাত রেখে ঠিক ওর পিছনে ওটা কে দাঁড়িয়ে? একটা লম্বা কুচকুচে কালো চেহারা। চুলগুলো মুখের সামনে থেকে সরে এসেছে। টর্চের আলোটা, সরাসরি পড়ছে সেই ভয়নঙ্করীর মুখে... কিন্তু এটা কে? এটা কী ধরনের মুখ, চোখের জায়গায় দুটো বড় বড় হলদেটে অংশ। আর নাক মুখের বদলে। একটা বড় কালো গহ্বর, যাতে গিজগিজ করতে তীক্ষ্ণ দাঁতের ফলা। সকলে আপাদ মস্তক কেঁপে উঠল।
আচমকা কাছাকাছি, আবার সেই তীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ। আর তারপরেই, সেই বিশ্রী মাছের আঁশটে গন্ধ।
রিপন, মাসুদের দিকে তাকিয়ে বিবির করে বলে উঠল, “চাচা... আমারে বাঁচা...” কথাটা শেষ করতে পারলো না ছেলেটা। চোখের পলকে সেই ভয়ঙ্করীর মুখের গহ্বরখানা বড় হয়ে, পুরো মাথাটা মুখের মধ্যে গিলে, নিলো। তারপর তীক্ষ্ণ দাঁতের চাপ দিতেই, ধড় থেকে মু ণ্ডুটা আলাদা করে, থু করবার মত করে, একপাশে ছুঁড়ে ফেলতেই, সেটা গড়াতে গড়াতে মাসুদেরই পায়ের কাছে এসে পোঁছালো। কয়েকমুহূর্তের মধ্যে পুরো ঘটনাটা ঘটল। সকলে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সেইদিকে। ভয় আর আতঙ্কে, কারোর গলার ভেতর থেকে আওয়াজটুকুও বেরোচ্ছে না। রিপনের মু ণ্ডুহীন কাটা ধড়টা পড়ে কাটা ছাগলের মত ছটকাচ্ছে। আর সেই কাটা জায়গা থেকে ফি নকি দিয়ে র ক্ত এদিক, ওদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সকলেই অবাক চোখে দেখল, জিনিসটা ধীরে ধীরে কালো ধোঁয়ার মত ঘেরে ধরেছে রিপনের মৃত শরীরটাকে। বন্ধন সাহেব জানেন, একটু পরেই ওই জায়গায়, রিপনের শরীরটা থাকবে না। থাকবে, পড়ে, র ক্ত, র স মাখানো কতগুলো হা ড়গোড়। এই টুকুই তাঁদের হাতে মাত্র সময়।
তিনি প্রতিভাসের দিকে হাত বাড়ালেন। “লকেট? লকেটটা দিয়েন...”
“লকেট?” প্রতিভাস অবাক “কোন লকেট?” এইসব দেখে প্রতিভাসের যেন মাথা কাজ করছে না।
“সুরাইয়া তাবুসি। বাথরুমে যাওয়ার সময় যা আপনার হাতে দিলাম। ওটা দিয়েন...”
“ওটা...ওটা...আমি ওই টেবিলের উপরে...” কথাটা বলেই সামনের টেবিলের উপর ইঙ্গিত করল প্রতিভাস। কিন্তু না, ওখানে তো কোন লকেট নেই। “আ... আ মি আমি ওখানেই রেখেছিলাম।“ বন্ধনবাবু ছুটে গেলেন সেই টেবিলের কাছে। না, ওখানে কোন লকেট নেই সত্যি সত্যিই।
“নাহ, এইহানে তো, কোন লকেট নাই। কোই রাখসেন...” এই প্রথম বন্ধনবাবুর গলাটা কেমন জানি ভয়ে কেঁপে উঠল।
বন্ধন সাহেবের গলার ভয়টা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ল বাকীদের মধ্যে।
প্রতিভাস যেন পাথরের মত হয়ে গিয়েছে। তার গলা দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। “আ... আমি ও...ওখানেই রেখেছিলাম। বিশ্বাস করুন।“
“নাহ, এইখানে নাই।“ চিৎকার করে উঠলেন বন্ধন সাহেব।
পাশ থেকে পরিতোষবাবু বলে উঠলেন, “আ...আমিও তো দেখসি উনি ওইহানেই রাখলেন...”
“তা... তাহলে কী কেউ ওখান থেকে সরাই দিয়েসে...। ইচ্ছা কইরা? তাহলে কী এটা করলো হেই মাইনসে যে নাকের বাঁধন খুইলা আমাগো বিপদ ডেকে আনসে। সাবধান, সেই মানুষ রইসে আমাগো মধ্যেই... সেই বিশ্বাসঘাত...”

কথাটা শেষ হল না, তার আগেই, বন্ধন সাহেবের বু কটা এ ফোঁড় ওফোঁ ড় হয়ে গেলো। সকলে ভয় বিহ্বল চোখে দেখল, একটা একজোড়া কালো হাত তীক্ষ্ণ অ স্ত্রের মত ঠিক বুকের মাঝখানটা ফা লাফা লা করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, বুকের ভেতর থেকে উ পড়ে এনেছে, তার হৃৎপি ণ্ড। আলাকুতি বিবি! কখন জানি, রিপনের শরীরের মাংসটা শেষ করে, উঠে দাঁড়িয়েছে, সকলেরই অলক্ষ্যে। বুকের জায়গাটা মুহূর্তেই ভরে উঠল র ক্তে। শুধু তাই নয়, গলার ভিতর থেকেও বেরিয়ে আসতে লাগলো, র ক্তের ছলক। বন্ধন সাহেব কোনরকম ভাবে, সেই অবস্থাতেই বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "পালাও... পালাও সবাই।"

আর ঠিক তারপরেই, সেই কালো শরীরটা একইভাবে গিলে খেয়ে নিলো তার মাথাটা।

ব্যস! এই দৃশ্য দেখে আর কেউ স্থির থাকতে পারল না। মরণ আর্তনাদ করে যে যেইদিকে পারল ছুটে পালালো।

৩) জলের রানি

কতক্ষণ এইভাবে বসে রয়েছে ওরা জানা নেই। ওরা বলতে শতিভু আর পরিতোষবাবু। দোতলার এই কেবিনঘরটা সম্ভবত বন্ধন সাহেবের। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে, তাতে পিঠ ঠেসে বসে আছে ওরা। দুজনেই ভয় আতঙ্কে পাথরসম। বেশ কিছুক্ষণ আগে এসেছে ওরা। শতিভুর অন্ধকার কেবিনের ছোট্ট জানালার বাইরে তাকিয়ে। আকাশে চাঁদ উঠেছে ইতিমধ্যেই। ঈষৎ জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়েছে চরাচরে। কথায় বলে, চাঁদের আলোয় নাকি হাওরের অন্যরকম সৌন্দর্য হয়। এরকম সৌন্দর্য, দেখবার জন্য এসেছিল তাঁরা। সায়নী আর ঝুমুরের অবস্থা সে নিজের চোখে দেখেছে। রঙ্গন আর প্রতিভাস কোথায় লুকিয়ে আছে সে জানে না। আচ্ছা? ওরা বেঁচে আছে তো? বেঁচে না থাকলে? উফ! কী ভেবেছিল সে এই ট্রিপটা নিয়ে। আর কী হয়ে গেল? একটা কান্নার দমক গলার কাছে এসে আছড়ে পড়বে, ঠিক এমন সময়ই পরিতোষ বাবু বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "আমার স্ত্রী আর বাচ্চাটা বাইচ্যা আহে তো?"
শতিভু সতর্ক হয়ে, ফিসফিস করে উঠল। "আস্তে কথা বলুন। সে শুনতে পেয়ে যাবে।"
"আমরা বাঁচতে পারুম না তাই না? সকলরে কেমন কইরা মারতাসেন দেখলেন?"
"জানি না। আমি যাদের সঙ্গে এসেছিলাম তাঁদের মধ্যে দুজন অলরেডি মরে..." কথাটা শেষ হল না, আচমকা শতিভু টের পেল, পিঠের দিকে একটা চাপ। দরজাটা কেউ শব্দহীন ভাবে ধাক্কা মেরে খোলার চেষ্টা করছে। আঁতকে উঠল ওরা? কে? সেই ভয়ঙ্করী নাকি?
"কে আছে ভেতরে?" উল্টোদিক থেকে একটা চেনা স্বরে চমকে উঠল শতিভু। প্রতীর গলা না?
"কে আছো ভেতরে দরজাটা খোলো প্লিজ!"
"কে? প্রতি? তুই আছিস বাইরে?" শতিভুর কণ্ঠে চাপা উচ্ছ্বাস।
"কে? শত? শত আছিস ভিতরে। দরজাটা খোল। প্লিজ দরজাটা খোল।"
"হ্যাঁ, দাঁড়া। এক্ষুনি..." শতিভু তড়িঘড়ি দাঁড়িয়ে, দরজার লকটা খুলতে যেতেই, পরিতোষ বাবু বাঁধা দিয়ে উঠলেন, "কী করতেসেন আপনি? দরজা খুলতেসেন ক্যান?"
"কী আশ্চর্য!শুনতে পারছেন না আমার বন্ধু এসেছে বাইরে?"
"আর এটা যদি, সেই ভয়ঙ্করীর কোন চালাকি..."
"শত দরজাটা খোল। প্লিজ! তাড়াতাড়ি খোল কেউ একটা উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। শত..."
শতিভু, ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো। "ও আমার বন্ধু, পরিতোষ বাবু। ওকে আমি চিনবো না?"
কথাটা বলে, ঝটকা মেরে দরজাটা খুলে দিতেই ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে এলো একটা লম্বা চওড়া শরীর। অন্ধকারে মুখ দেখার উপায় নেই, চাঁদের আলোয় যতটুকু দেখা যায়, বোঝা যাচ্ছে সেটা প্রতিভাস ই।ঘরের ভেতরে ঢুকেই সে হুড়মুড় করে দরজাটা ভেতর থেকে লাগিয়ে দিলো। প্রতিভাস দরজাটা লাগিয়ে হাঁপাতে লাগলো।
"প্রতি... প্রতি তুই কোথায় ছিলিস?" শতিভু আবেগের বসে অন্ধকারেই জড়িয়ে ধরল প্রতিভাসকে। তার মাথাতেও ছিল না যে এই ঘরে, রয়েছন পরিতোষ বাবু। "আমি... আমি তো ভেবেছিলাম তোকে আর কখনওই দেখতে পাবো না, জানিস।"

পরিতোষ বাবু একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন চুপটি করে। শতিভুর চোখের জল যেন বাঁধ মানছে না।
“দেখলেন তো পরিতোষ বাবু। আমি বলেছিলাম না। এ আমার বন্ধু। আমার বন্ধুকে আমি চিনবো না। তাও হয়? জানিস প্রতি, পরিতোষ বাবু বলছিলেন, দরজাটা না খুলতে। এটা নাকি বিবির কোন চালাকি।“
“তোর দরজাটা সত্যিই খোলা উচিত হয় নি।“ কতগুলো ঘড়ঘড়ে শব্দ বেরিয়ে এলো প্রতিভাসের গলার ভেতর থেকে। শতিভু কথাগুলো বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে উঠল আরেকবার, “কী বললি তুই?”
পরক্ষনেই একটা, হিশহিশে স্বর ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।
“হাওরের হাওয়া... হাওরের পানি...
আলাকুতি বিবি… হাওরের রানি...”
ছিটকে সরে এলো শতিভু। ততক্ষণে ঘরের বাতাস ভারি করে তুলেছে মাছের বিশ্রী আঁশটে গন্ধে। ঠিক সেই মুহূর্তেই, কাছে পিঠে বেজে উঠল, সেই চেনা শিসের শব্দ। এই শব্দের অর্থ ওরা জানে। আলাকুতি বিবির শিকার করার শব্দ...
শতিভু, পকেট হাতড়ে দ্রুত বের করে আনলো, ছোট লাইটারটা। হাত কাঁপছে তার। বুকের ভেতরটা হাপরের মত ওঠানামা করছে। তারপরেও, শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে, লাইটার টা জ্বালাতেই, একটা ক্ষীণ হলুদাভ আলো ছড়িয়ে পড়ল, ঘরের ভেতরে। কিন্তু তাতেই যা দেখার দেখে ফেলেছে শতিভু। তার সামনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে প্রতিভাস নয়। এই ভয়ঙ্কর মুখটা সে একটু আগেই হলঘরে দেখেছে। দুটো বড়বড় মনিহীন হলুদ চোখ। আর একটা কালো গহ্বর। যার ভিতরে থরে থরে গিজগিজ করছে দাঁতের সারি।
*****
রঙ্গন ফিসফিস করে বলে উঠল, “এভাবে বসে থাকলে হবে না বীথি। আমাদের পালাতে হবে।“
বীথি, অন্ধকারের মধ্যেই আঁতকে উঠল, “কিন্তু ঈষিকা?”
“আগে নিজে তো বাঁচুন। তারপর নইলে অন্যের কথা ভাববেন।“ কথাটা ফিসফিস করে বলে উঠেও ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল রঙ্গন। তারপর থেমে থেমে বলে উঠল, “আমি যাদের সঙ্গে এসেছিলাম, তাঁদের দুজন আমার চোখের সামনে মারা গেল। বাকি দুজন বেঁচে আছে কিনা আমার জানা নেই। একটু আগেই সেই শিসের শব্দ পেলেন না, তারপরই ওই চিৎকার? কে বলতে পারে, ওটা আমার বন্ধুদের নয়? অথবা আপনার কাজিনের?”
রঙ্গন আর বীথি দুজনেই লুকিয়ে বসেছিল একতলার স্টোররুমের ভিতরে। বন্ধন বাবুও যখন সেই ভয়ঙ্করীর হাতে মারা গেলেন, তারপরে যে যেইদিকে পেরেছে, প্রাণভয়ে লুকিয়ে পড়েছে। সেই হুড়োহুড়িতেই রঙ্গন আর বীথি এক জায়গায়।
“কিন্তু পালাইবো কেমন কইরা?”
“বোটের পেছন দিকে আমি একটা ডিঙি দেখেছি...ওটা একবার জলে নামাতে পারলেই...”
কথাটা বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ালো রঙ্গন।“কোথাও না কোথাও তো পৌঁছাবই। এই হাওরের তো কুল থাকবেই। তাই না? আসুন?”
বীথি রঙ্গনের পিছন পিছন বেরিয়ে এলো স্টোররুম থেকে। একতলাটা অন্ধকার। তবে ঘুটঘুটে নয়। বাইরের চাঁদের আলোর ঈষৎ আবছা আলো এইমুহূর্তে ঘরের ভেতরটা আবছা হলেও দেখা যাচ্ছে।

রঙ্গন বীথির হাত ধরে, খুব ধীরে ধীরে প্রায় শব্দ না করে, বোটের পেছন দিকে চলে এলো। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে, দুটো ডিঙি পরপর, তোলা রয়েছে বোটের পেছন দিকে। কিন্তু হাওরের এ কী অবস্থা? জল দেখা যাচ্ছে না। পুরো হাওর জুড়ে, যেন ভারি কুয়াশার চাদর কেউ বিছিয়ে দিয়েছে অচিরেই। কিন্তু এসব আর তাঁদের আটকাতে পারবে না।
বীথি আর রঙ্গন, প্রায় কোন শব্দ না করে হাতে হাত লাগিয়ে, ডিঙিটাকে জলে ফেলতেই ছপাক করে একটা শব্দ হল। রঙ্গন এক মুহূর্ত দেরী না করে, দুটো দাঁড় হাতে তুলে, ডিঙিতে উঠে দাঁড়ালো।
"বীথি জলদি। জলদি করুন।" বীথিও এক মুহূর্ত দেরী না করে রঙ্গনের হাত ধরে চটপট বোট থেকে ডিঙির উপরে উঠে এলো। পালাতে হবে। সত্যিঈ পালাতে হবে এই বোট থেকে অনেক দূরে। সে বুঝতে পেরেছে, এখানে থাকলে বাঁচার সম্ভাবনা নেই। এখানে থাকলে সকলকেই মরতে হবে সেই ভয়ঙ্করীর হাতে। আর পালালে? পালালে কী তাঁরা বাঁচবে? উত্তর জানা নেই। পালিয়ে কোথায় যাবে তাও তার জানা নেই।
দুজনেই দাঁড় বাইছে। বীথি এর আগে কখনো দাঁড় বায়নি। যতটুকু দেখেছে, তাও টেলিভিশনে। কিন্তু এখন যেন সে সব কিছুই পারছে। রঙ্গনের একটু গাইডেন্সে যেভাবে পারছে, দুজনে দাঁড় বাইছে। জলের উপর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে, দাঁড় টানার। দেখতে দেখতেই তাঁরা ময়নামুখী থেকে দূরে চলে আসছে। ঈষৎ চাঁদের আলোয়, অন্ধকার ময়নামুখীকে একটা কালো দৈত্যের মত দেখতে লাগছে। থেকে থেকেই যেখানে এক ভয়ঙ্করী র ক্ত স্না ন করছে।
ভয়ঙ্কর কুয়াসার চাদরের বুক কেটে এই আধো অন্ধকারের মধ্যেই, ওরা দুজন ডিঙি বেয়ে এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। ইতিমধ্যেই আর ময়নামুখিকে দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার চাদর ঢেকে ফেলছে, তাঁদের আর ময়নামুখীর মাঝের পথ।
"ভাইয়া... একটু দাঁড়ান।" হাঁপাতে হাঁপাতে কথাটা বলেই, দাঁড়টা তুলে রাখলো বীথি। "আমার হাত ব্যথা করতেসে। একটু দাঁড়ান।"
"না বীথি, আমাদের দাঁড়ালে চলবে না। আমাদের যতটা সম্ভব দূরে..." কথাটা বলতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে গেলো রঙ্গন। জলের ভেতর থেকে, বুদবুদ উঠে এলে, যেমন শব্দ বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনই একটা শব্দ হল খুব কাছেই। চমকে উঠে অন্ধকারে মধ্যেই, বীথির দিকে তাকালো সে। বীথিও শুনতে পেয়েছে সেটা। প্রথমে শব্দটা আস্তে আস্তে হলেও, ধীরে ধীরে, শব্দটার জোর বাড়তে লাগলো। শব্দের উৎস লক্ষ্য করতে, রঙ্গন উঠে দাঁড়াতেই, ডিঙিটা খানিকটা দুলে উঠল। রঙ্গনের চোখ, শব্দের উৎস লক্ষ্য করে বীথির একেবারে পেছন দিকেই।
অন্ধকারেই সে দেখতে পেয়েছে, ঠিক যেইখান থেকে বুদবুদ শব্দটা আসছিল, ঠিক সেখানেই হাওরের জলে জেগে রয়েছে একটা মাথা। নাকের নীচ থেকে বাকীটা জলের তলায়। সম্ভবত, মুখটা জলের তলায়, আর সেখান থেকেই এই শব্দ। কালো কুচকুচে মুখে, কিছুই চোখে পড়ছে না, শুধু দুটো হলুদ চোখ ছাড়া। বীথিও হঠাৎ করেই, রঙ্গনের পা খামচে ধরল। বুদবুদের আরেকটা বুদবুদের শব্দ, ঠিক ডিঙিটার ডানপাশে। বীথি আঙুল তুলে রঙ্গন দেখতে পেল, ঠিক সেখানেই আরেকটা কালো কুচকুচে মাথা, জলের ভেতর থেকে মুখ তুলেছে। আরেকটা বুদবুদএর শব্দ। তারপর আরেকটা। তারপর আরেকটা... তারপর আরেকটা। দেখতেই দেখতে, ওদের চারিদিক থেকে অসংখ্য বুদবুদের শব্দ। অসংখ্য কালো কালো মাথা।

রঙ্গন আর বীথির বুকটা খালি হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। তাঁদের হাত পা যেন পাথরের মত ভারী হয়ে গিয়েছে। তাঁরা নড়তে পারছে না। ওদের ডিঙিকে কেন্দ্র করে জিনিসগুলো আচমকাই, চারিদিক থেকে তাঁদের দিকে এগোচ্ছে। ওরা জানে, এই কালো কুচকুচে মাথার নীচে একটা করে কালো কুচকুচে শরীর রয়েছ, যেটা দেখা যাচ্ছে না। এই শরীর তাঁদের চেনা। এরকমই একটা শরীর তাঁরা দেখে এসেছে, ময়নামুখিতে।
আচমকা সেই চেনা শিসের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। আর সেই বিশ্রী আঁশটে গন্ধ। এই গন্ধ তাঁদের চেনা। এই শব্দও। তাঁরা জানে কে আসছে, শিকার নিতে। কী যেন ছিল ছড়াটা?
হাওরের হাওয়া... হাওরের পানি...

অন্তিম পর্ব

১) যারা আসে, তারা ফেরে না

দুহাতে কান চাপা দিয়ে শুয়ে রয়েছে ঈষিকা। এমন সময়ই, তার খুব কাছেই একটা বাচ্চা, বিড়বিড় করে বলে উঠল, "মা, ক্ষুধা লাগে"

আঁতকে উঠল ঈষিকা। অন্ধকার ঘরে, খাটের তলায় এতক্ষণ একভাবে লুকিয়ে থাকতে থাকতে সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল যে তার সঙ্গেই এই মুহূর্তে তার পাশে রয়েছেন, পরিতোষবাবুর স্ত্রী আর সেই ছোট ছেলেটা। এই মুহূর্তে, খাটের তলায়, ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে।

"চুপ!চুপ! কথা কইয়ো না। কথা কইলেই সে আইয়া পড়ব।" পরিতোষ বাবুর স্ত্রীর নাম মধু। আর এই পুচকের নাম টুকু। ছেলেটি বাচ্চা হলেও অনেক কিছু বোঝে। অন্য বাচ্চারা, অন্ধকার ঘনালে, এসব দেখলে হয়তো চিল চিৎকার জুড়ত। কান্নাকাটি করতো মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু টুকুসোনা একেবারে শান্ত হয়ে রয়েছে।

"কিন্তু এইভাবে কতক্ষণ?"

"বউদি, কথা কইয়েন না। শোনেন নাই, শব্দ করলেই সে চইলা আইব।" ঈষিকা, কথাটা সতর্কতার সঙ্গে বলে উঠতেই, মধুদেবী মাথা নাড়ালেন, "না বোন। এইভাবে, কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়?"

"ফজর পর্যন্ত?" ঈষিকা গলার স্বরটা একেবারে, খাদে নামিয়ে আনলো। সিঁড়িতে কী একটা মচমচ শব্দ পেল সে?

"আর যদি না ভোর হয়? যদি না আর সূর্য ওঠে?"

"মানে?"

"এডা তো আলাকুতি বিবির বাসা। মরা হাওর। এই জায়গার তো অস্তিত্ব নাই। এ এক অলীক জগত। এইহানে তো তার ইচ্ছার বাইরে কিস্সুই হয় না। সে যদি না চায়, সূর্য উঠবে না, তাহলে উঠবে না। এবার কও, এই ভাবে কী অপেক্ষা করবে? কতক্ষণ করবে?"

"তাইলে উপায়?"

"পালাইতে হইব? কে কে বাইচ্যা আছে দেখতে হইব? সবাই কে নিয়া পালাইতে হইব। কেউ না থাকলে, অন্তত আমাগো পালাইতে হইব। চলো, কোন শব্দ না কইরা, বাইরে বেরোই।"

ওরা তিনজন ধীরে ধীরে খাটের নীচ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। মধুদেবী নিজের ছেলেকে, কোলে তুলে দরজার সামনে এগিয়ে গেলেন। দরজায় কান ঠেকিয়ে কিছু একটা শোনার চেষ্টা

করলেন তিনি। নাহ, বাইরে কোন আওয়াজ হচ্ছে না। ঈষিকার হাতে একটা টর্চ। কিন্তু সে জানে, এই মুহূর্তে টর্চ জ্বালানোর অর্থই হল বিপদ কে ডেকে আনা। মধু দেবী নিজের ছেলেকে, ঈষিকার কোলে তুলে দিলেন।

"বোন, আমার ছেলেরে একটু ধইরো। আমি আগে বাইরে, যামু। আমার পিসন পিসন তুমি আইসো।"

"বউদি, আপনি রাহেন আপনার ছেলেরে, আমি যাই সামনে।"

"নাহ, বোন। তুই জাইস না। আমি যাই, তুই শুধু ওরে, সামলাইয়া রাখিস। জানি না, হেডা বাঁচব কিনা। তাও দেহি পারি কিনা।"

কথাটা বলতে বলতেই, প্রায় ঈষিকার বাধা উপেক্ষা করে তার কোলে নিজের ছেলেকে তুলে দিলেন মধুদেবী। পুরো কথাটাই এতক্ষণ হচ্ছিলো, প্রায় হিশহিশ করে। বাতাসের চেয়েও ক্ষীণ স্বরে যাতে সেই ভয়ঙ্করীর কানে, তাঁদের কথাটুকুও না পৌঁছায়। প্রায় কোন শব্দ না করে মধু দেবী দরজার হাতলে চাপ দিয়ে দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। করিডোরটা রুমের থেকেও বেশি অন্ধকার যেন।

"আইসো। তয় আওয়াজ কইরো না।" কথাটা বলেই তিনি ঈষিকার হাতে টর্চ লাইটটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তার পিছন পিছন টুকু কে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঈষিকা। দুজনেরই বুকের ভেতরটা আতঙ্ক আর উত্তেজনায় হাঁপরের মত ওঠানামা করছে।

করিডোর দিয়ে খুব একটা বেশি সামনের দিকে এগোতে হবে না। কয়েক পা গেলেই সামনের দিকে সিঁড়ি। অন্ধকারে কী আছে, পরিষ্কার বোঝা যায় না। আন্দাজ করে করেই সামনের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু আচমকা, কাঠের মেঝের উপর পড়ে থাকা চটচটে কিছুতে পা হড়কে গেলো ঈষিকার। পরিতোষ বাবুর ছেলে না থাকলে, হয়তো বেশি সুবিধে হত, কিন্তু তারপরেও, কাঠের দেওয়াল ধরে, কোনোমতে নিজের পতন রোধ করল সে। কিন্তু এরই মধ্যে যা অঘটন ঘটবার ঘটে গিয়েছে। একটা বিশ্রী কেঠো শব্দ। আর ঈষিকার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা সশব্দ, " আল্লাহ!"

মুহূর্তেই একটা শিসের শব্দ। সেই শিসের শব্দ, যা তাঁরা বহুবার শুনেছে, আজকের সন্ধ্যার পর থেকে। অন্ধকারের মধ্যেই, মধু দেবীর হাত চেপে ধরল সে প্রবল আতঙ্কে। আচমকা, বাতাস ভারী করা, সেই বিশ্রী মাছের আঁশটে গন্ধ, আর পেছনের দিক থেকে একটা দরজা খোলার বিশ্রী ক্যাঁচ শব্দ।

অন্ধকারে অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে নাকি চোখ সওয়া হয়ে যায়। তা নাহলে ওরা এই অন্ধকারে আবছা দেখতে পাচ্ছে কী করে, করিডরের ডানদিকের একটি কেবিনের দরজা খুলে, বাইরে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছে, এই অন্ধকারের থেকেও অন্ধকার একটি কালো ছায়া।

এক মুহূর্ত দেরী না করে, মধু দেবী হাতের টর্চলাইটের আলোটা জ্বালাতেই, অন্ধকার করিডোরের বুক ফালাফালা করে, একটা সাদা আলোর বর্ষা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো।

ওদের থেকে হাত পনেরো দূরত্বে বীথি দাঁড়িয়ে রয়েছে, করিডোরের ঠিক মাঝবরাবার। সারা পোশাক ভিজে সপসপ করছে, চুল থেকে, পোশাক থেকে ফোঁটাফোঁটা জল পড়ে, রক্তে মাখামাখি হওয়া কাঠের মেঝেটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। ও কী ডুব দিয়ে এসেছে নাকি হাওরের জল থেকে।

কিন্তু বীথিকে এরকম অস্বাভাবিক লম্বা লাগছে কেন? মনে হচ্ছে, শরীরটা যেন হুট করেই অনেকটা লম্বা হয়ে গিয়েছে, শুধু তাই নয় ঘাড়টা একপাশে হেলে রয়েছে, সেই সঙ্গে ঠোঁটে ঝুলছে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ হাসি। নাহ, এ বীথি নয়। বীথি এরকম নয়। আচমকা মধুদেবী টর্চটা ঈষিকার দিকে বাড়িয়ে সামনে এগিয়ে এলেন। আর ওমনি জিনিসটা ঘটল। আচমকা, বীথির শরীরটা বদলে গেলো, পরিতোষ বাবুর চেহারায়। সেই টাক মাথার চেহারার লোকটিকে একপাশে ঘাড় এলিয়ে ওইভাবে হাসতে কী ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে।

আচমকা, তার ঠোঁটের কোল থেকে সাপের শিসের মত হিসহিসে স্বরে বেরিয়ে এলো সেই চেনা কথাগুলো।

“হাওরের হাওয়া...হাওরের পানি...

আলাকুতি বিবি... হাওরের রানি...”

“পালাও বোন। পালাও...” চিৎকার করে উঠলেন মধুদেবী, “আমার ছেলেকে নিয়ে পালাও। পালাও এখান থেকে।“

ভয় পেয়ে টুকুসোনা, চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে।

ঈষিকা চিৎকার করে উঠল, “আর তুমি?”

“আমি একে আটকাচ্ছি। তুমি পালাও...” কথাটা বলেই মধুদেবী এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। ঈষিকা তার হাতটা চেপে কেঁদে উঠল, “বউদি যাইয়েন না। আপনি মারা যাইবেন।“

ঈষিকার কথাটা শুনে, মধুদেবী হেসে উঠলেন “ তুমি শুধু টুকুরে বাঁচাইয়ো। তাইলেই হইব। আমি ওরে আটকাইতেসি। তুমরা সেই সুযোগে পালাইয়ো। মাথায় রইখো, সবাই মরবার পরে, দুলাকে নিশ্চয়ই গতবারের মত হাওর ফিরায় দিবো।“ কথাটা বলেই নিজের ছেলের কপালে একটা চুমু খেয়ে, ঈষিকাকে একতলার সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিলেন মধু দেবী। টুকুসোনা, তার মায়ের দিকে দুইহাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, “মা... মা...” কিন্তু মধুদেবী সেই ডাক উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। টর্চের আলোটা, সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটার মুখের উপরে পড়ছে। ঈষিকা দূর থেকে দেখতে পেল, পরিতোষবাবুর চোখটা ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে যাচ্ছে। আর নাক মুখ সরে গিয়ে সেই জায়গায়, একটা কালো গহ্বর তৈরী হচ্ছে ধীরে ধীরে। আর পুরো শরীরটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, কালো রঙে। ঈষিকা, টুকুর মুখে হাত চাপা দিয়ে, দৌড়ে এগিয়ে গেল, একতলার সিঁড়ির দিকে। সে জানে না, বাঁচার উপায় ঠিক কী? কিন্তু তারপরেও একটা শেষ সুতো সে পেয়েছে। ওই সুতো টুকুই তার শেষ ভরসা।

২) হুলা

অন্ধকারের মধ্যেই কেবিনের খোলা দরজার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মাসুদ। একটা শীতল শোঁ শোঁ হাওয়া বইতে শুরু করেছে, অনেকক্ষণ আগে থেকেই। সেই সঙ্গে মাঝে মধ্যেই দুলে দুলে উঠছে ময়নামুখী। ছোট ছোট ঢেউ উঠছে ময়না মুখী জুড়ে? কেন? নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছে বলে?

ঘাটে যে কাণ্ডটা ঘটল, হাওরে ময়নামুখীকে নামানো নিয়ে তা আমাদের সকলেরই প্রায় জানা। কিন্তু যা সকলে জানে না, এরই মাঝে নিজের মেয়েকে খবর পাঠিয়েছিল মাসুদ। প্রত্যেকবার ময়নামুখি ঘাট ছেড়ে হাওরে এলে, মেয়ে নিজে আসে, তাকে বিদায় জানাতে। কিন্তু আজ তার অভিমান এতই তীব্র ছিল যে, ঘাটে এত এতো মানুষের ভিড়ে নিজের প্রাণাধিক প্রিয় কন্যার মুখ সে খুঁজে পায় নি। আজ, তারই কি শাস্তি ওপরওলা, এইভাবে তাকে দিচ্ছেন? তা ছাড়া রিপন! ওই ছোট্ট ছেলেটা, যাকে তার মা কেবলমাত্র তার ভরসাতেই এই হাওরে পাঠিয়েছিল, কী জবাব দেবে সে তার মা কে? কথাটা ভাবতে ভাবতেই, আচমকা রিপনের মৃত্যু দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই শিউরে উঠল মাসুদ। ওই পিচ্চি বাচ্চাটা কী মারা গেছে ইতিমধ্যেই? তাকে মেরে ফেলেছে আলাকুতি? আর ওই চঞ্চল মেয়েগুলো। একটু আগেই বাচ্চাটার চিৎকার করে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ছিল মাসুদ। উফ! কী ভয়ঙ্কর ওই আর্তনাদ। এখান থেকে বেরোতে পারলে, আলাকুতির হাতে একই ভাবে মৃত্যু হবে তার। নাহ সে মরবে না।

ঠিক এমন সময়, দরজার বাইরে একটা কালো ছায়া। প্রথমে অন্যমনস্ক ছিল তাই খেয়াল হয়নি, পড়ে নজরে আসতেই শিউরে উঠলস সে। দরজার বাইরে আলাকুতি বিবি? অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। একটা লম্বা চওড়া কালো দেহ। আচমকা, ছায়াটা বাতাসে নাক উঁচিয়ে কীসের যেন গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করছে। সর্বনাশ! তার দেহের গন্ধ কী? ছায়াটা হঠাৎ তারই দরজার দিকে এগিয়ে এলো, তারপর, চৌকাঠে, হাত রেখে ঘরের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল,

"মাসুদ চাচা? আছস মাসুদ চাচা? আছস..."

"হুলা?"

তার কণ্ঠে কোন জড়তা নেই। আগের মধ্যে কোন তোতলামো নয়। বরং বলিষ্ঠ পরিষ্কার শব্দ। মাসুদ চুপ করে রইল। হুলার এরকম পরিবর্তন কী করে? কে বলবে এই সেই পাগল? আচ্ছা, এ কী সত্যি হুলা? হুলা না হয়ে যদি অন্য কেউ হয়? অন্ধকারে তো মুখ দেখা যায় না। গলা বদলে, যদি আলাকুতি বিবি এসে থাকে? না কোন কথা বলবে না সে।

"আমি জানি তুই আছস? হোন, তোরে জবাব দিতে হইব না। আলাকুতি বিবি, আমাদের খুঁজা পায় তহনই যহন, সে আমাগো শরীলের গন্ধ পায়? আর সে আমাগো, শরীলের গন্ধ কেমনে পায়?

মাসুদ অন্ধকারেই বিড়বিড় করে ওঠে, "আমরা তার গন্ধ পাইলে..."

“হ।“ হুলা, অন্ধকারেই এমন ভাবে কথাটা বলে উঠল, যেন সে ওই ফিসফিসে স্বরটুকুও শুনতে পেয়েছে, “নাক ঢাইক্যা রাহস। আলো না জ্বালাইয়া। শব্দ না করলেই সেই টের পাইব না যে তুই আসস। বুঝসস আমার কথাটা?”

মাসুদ, অন্ধকারে চুপ ওরে রইল, হুলা এগুলো কি বলছে? কেন বলছে? কিন্তু সে কোন রিস্ক নেবে না? অন্ধকারের মধ্যে তার লুকিয়ে থাকাই শ্রেয়।

“সেইবারে এইহান থিকে একজন গেসিলো। কেন গেসিল জানা নাই। এইবাইরেও যাইব। তবে সে একলা ফিরতি পারব না। তার ডিঙিতে, একজন মানুষ লাগবো , যার শরীলে, হাওরের রক্ত, মাঝির রক্ত আসে। তবেই সে ডিঙি মড়া হাওর ছাড়তি পারবো। গতবারে, আমায় বাচাইসিল ক্যান বুঝলি এবারে? এবারেও সে চায়, তোদের সকলরে মাইরা, আমারে লইয়া আবার যেতি। সে যাইব, যাতে আবার অনেক লোক লইয়া ফিরতে পারে। উঁহু তা হতি দিব না...তা হতি...”

আচমকা সিঁড়িতে একটা মচমচ শব্দ। হুলা, এত জোরে জোরে কথাগুলো বলছিল যে, মাসুদ যা ভয় পাচ্ছিল তাই হল। সেই ভয়ঙ্করী পেয়ে গিয়েছে, তার অস্তিত্ব। হুলা, একবার সিঁড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই কোথায় যেন ছুটে পালালো। মাসুদ দেখল, আচমকা ধুপধাপ করে পায়ের শব্দ। আর ঠিক তার কেবিনের দরজার বাইরেই একটা বেঁটে খাটো কালো শরীর।

“কেউ আসেন?” একটা মেয়েলি স্বর বাতাসে ছড়িয়ে পড়তেই, বক্তা কে তা স্পষ্ট হয়ে গেলো, মাসুদের সামনে। রোজিনা বানু। মহাসীন সাহেবের স্ত্রী। তিনি এইভাবে এখানে কেন?

“কেউ আসেন?” রোজিনা বানু কথা বলতে বলতেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন। “কেউ বাঁচান আমায়। প্লিজ কেউ বাঁচান।“ আর স্থির হয়ে থাকতে পারল না মাসুদ। কী আশ্চর্য এইভাবে জোরে জোরে কাঁদতে থাকলে তো, আলাকুতি সহজেই খুঁজে পেয়ে যাবে তাকে। আর প্রয়োজনে মাসুদকেও। না না ওনাকে থামাতেই হবে।

কেবিনের অন্ধকার কোণ থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো মাসুদ। গলার স্বর প্রায় খাদে নামিয়ে, বিড়বিড় করে বলে উঠল,

“আপা থামেন। চিৎকার কইরেন না।“

অন্ধকারের মধ্যে আচমকা মাসুদকে খুব কাছেই দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন রোজিনাবানু।

“কে? কে আপনে?”

“আমি? আমি মাসুদ? নৌকার মাঝি? মাসুদ মিঁয়া।”

“অ। আপনে? আর কে আছে সঙ্গে?”

“আর কেউ নাই আপা। আপনি আসেন। লুকায় পড়েন আঁধারে। আর চুপ থাইকেন,”

“হুলা কই গেল?”

মাস্থদ কী একটা বলতে গিয়েও কেমন করে জানি থমকে গেল। মহিলার গলার স্বরটা কেমন জানি ঘড়ঘড়ে শোনালো। থিক যেন গলায় কফ জড়িয়ে কথা বলছেন।

" আপনি ভেতরে আসেন বলতেসি সব। আস্তে কথা বইলেন।ছলা ছিল, একটু আগেও। হুট করে কোথায় যেন..." কথাটা বলতে বলতেই থেমে গেলো মাস্থদ। সিঁড়ি ঘর থেকে বেরলেই মুখোমুখি ছটো রুম। ছটো রুমের মাঝের প্যাসেজের মাথাটা ঢাকা থাকায়, খানিকটা করিডোরের মত দেখতে লাগে জায়গাটা। তাপরেই ফাঁকা ছাদ। চাঁদের জ্যোৎস্না আলোর আভা কিছুটা সেই করিডোরের ভেতরে এসে পড়লেও জায়গাটা এখনো অন্ধকার। অন্ধকারে, ভালো করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মহিলার চেহারাও দেখা যাচ্ছে না ঠিক করে...। একটা কালো অবয়ব বই কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

"আপু, আপনি কী করে জানলেন, যে ছলা এইহানে আসিল? আপনি আহনের আগেই তো..."

"আমি... আমি আসলে...ওর গলা শুনতে পাইসিলাম..."

"উঁহু। ছলা তো তার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে কথা কইতেসিল না, তাহলে আপনি ক্যামেনে জানলেন, যে কথা কইতেসিল সে ছলাই..." কথাটা শেষ হল না, সাথে সাথে একটা কালো বড় হাত, তার গলাটা চেপে, শূন্যে তুলে ধরল। তারপর, এক ঝটকা মেরে, সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলতেই, মাস্থদের ভারী শরীরটা বলের মত প্রায় বিশ ফুট দুরে খোলা ছাদে গিয়ে আছাড় খেল। সাথে সাথে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল সে। ডান কাঁধটায় লেগেছে মনে হয়। কিন্তু এসব দেখার মত সময় নেই। আচমকা, একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। সেই সঙ্গে সেই পরিচিত মাছের আঁশটে গন্ধটা। তার মানে...?

মাস্থদ ভয় বিস্ফারিত ভঙ্গীতে দেখল সেই অন্ধকার জায়গাটা থেকে ধীরে ধীরে অদ্ভুত ভঙ্গীতে সামনের দিকে এগিয়ে আসছেন, রোজিনা বাতু। কিন্তু তার পরেই যা হল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অ্যাসিড পড়লে যেমন চামড়া গলে যায়, ঠিক তেমন ভাবেই রোজিনা বাতুর দেহ থেকে, খসে পড়ছে তার চামড়া গুলো। আর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা কালো ছায়া মূর্তি। জিনিসটা পা পা করে, একে বেঁকে, শরীরটাকে কখনো সামনে ঝুঁকিয়ে কখনো পেছনদিকে হেলিয়ে এমন ভাবে এগোচ্ছে, যে দেখে মাস্থদের মনে হতে, লাগলো প্রচণ্ড আতঙ্কের একটা ভয়ঙ্কর কিছু তার বুকে চাপিয়ে দিয়েছে। সে নড়তে পারছে না। পালাতে পারছে না। সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

সেই অন্ধকারের থেকেও ভয়ঙ্কর অন্ধকার ছায়ামূর্তিটা এই মুহূর্তে তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মাস্থদ জানে, এই জিনিসের ছটো বড় বড় হলুদ চোখ রয়েছে। আর মুখের জায়গায় রয়েছ, একটা কালো গর্ত। যেখান থরে থরে গিজগিজ করছে, অজস্র ফলার মত তীক্ষ্ণ দাঁত।

চাঁদের আলোয় মাস্থদ স্পষ্ট দেখল, জিনিসটা ধীরে ধীরে, তার ছটো হাত কে মাথার উপরে তুলেছে। আঙুলের তীক্ষ্ণ নখগুলো বর্ষার ফলার মত চকচক করে উঠল চাঁদের আলোয়। তাহলে কী

ওগুলো দিয়েই শেষ হবে সে? বুকে নাকি গলায়? কোথায় এফোঁড় ওফোঁড়। আর ভাবতে পারল না মাসুদ, কারণ তীব্রগতিতে সেই হাত নেমে এসেছে তার দিকে।

আচমকা কী যেন একটা হল। কেউ তার নাকের উপর দুইহাত দিয়ে একটা কাপড় ঠেসে ধরে, ধাক্কা মেরে একপাশে সরিয়ে দিলো। আর তারপরই একটা "আক!" করে শব্দ।

মাসুদ বিস্ফারিত নয়নে দেখল, মাত্র কয়েকমুহূর্ত আগে, সে যেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, সেখানে এই মুহূর্তে রয়েছে দুলা। আর আলাকুতি বিবির দুইহাতের তীক্ষ্ণ নখর, তার গলা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মাসুদ জানে, জায়গাটা এই মুহূর্তেই রক্তে ভরে উঠবে।

দুলা সাথে সাথে আলাকুতি বিবির দুই হাত চেপে ধরে কোনরকমে গোঙাতে গোঙাতে বলে উঠল, "বোট, ডিঙি, পালাও..."

ব্যাস! অতটুকুই। আর কথা বলতে পারল না দুলা। কারণ ততক্ষণে তার মাথাটা গিলে খেয়েছে একটা কালো গহ্বর। মাসুদ দিক্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো ছুটে। দুহাতে শক্ত করে সে নাকের উপরে চেপে ধরেছে দুলার দেওয়া কাপড়।

"আলাকুতি বিবি, আমাদের খুঁজা পায় তহনই যহন, সে আমাগো শরীলের গন্ধ পায়..."

নাহ। মাসুদ না আলাকুতি বিবির গন্ধ নেবে। না নিজের গন্ধ দেবে। সময় কম, এরই মধ্যে তাকে পৌঁছাতে হবে, একতলার ডিঙির কাছে।

৩) খোলস

“কী হল আপু? আপনি দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন?” অন্ধকার কিচেনের ভেতরেই রোজিনাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে প্রতিভাস ভয় পেল। “বসে পড়ুন। ও চলে আসবে। এন্ড প্লিজ! সাউন্ড করবেন না।“

কিন্তু রোজিনা বসলো না।

প্রতিভাস গলার স্বর প্রায় খাদে নামিয়ে প্রশ্নটা করল, “কী হয়েছে আপু? এতক্ষণ তো, ঠিক ছিলেন, হুট করে কী হয়ে গেল?”

প্রতিভাস আর রোজিনা, সেই হুড়োহুড়ি থেকেই লুকিয়ে বসেছিল এইঘরে। এতক্ষণ, রোজিনা বানু, মৃতের মত একপাশে পড়েছিল অন্ধকারে। কিন্তু মাত্র একটু আগেই বিকট আওয়াজ করে, হাই তোলা। আর আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ানো দেখেই কেমন যেন সন্দেহ হল প্রতিভাসের। ভাবখানা এমন যেন, কোন কাজের জন্য তাকে বিরক্তির সঙ্গে অপেক্ষা করতে হচ্ছিলো।আর কাজটা মাত্র মাত্র শেষ হয়েছ যেন।

“কি হল আপু? কথা শুনতে পাচ্ছেন না। বসতে বললাম...”

প্রতিভাস কিছু বুঝে উঠতে না পেরে, মহিলার হাতের কব্জি টা ধরে যেই তাকে বসাতে যাবে ঠিক তখনই, রোজিনা বানু প্রতিভাসের গলাটা চেপে ধরে, এক আসুরিক শক্তিতে ছুঁড়ে ফেলল, রান্নাঘরের বাসনের তাকের দিকে। সাথে সাথে ঝনঝন বিকট শব্দে, সব কয়টা বাসন নিয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল প্রতিভাস। পিঠে কোমরে, চোট পেয়েছে। যন্ত্রণায় টনটন করে উঠছে জায়গা দুটো। কিন্তু এখন এসব ভাবনার সময় নেই। সে দ্রুত পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে ফ্ল্যাশের আলোটা অন করতেই অন্ধকার রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়ল ফ্ল্যাশের বৃত্তাকার অনুজ্জ্বল আলোটা। সেই আলোয় প্রতিভাস হাঁ হয়ে দেখল। রোজিনা বানু, ধীরে ধীরে, তার মাথার হিজাবটা খুলে, একপাশে ছুঁড়ে ফেলে, ঘাড়টাকে, এমন ভাবে, দুদিকে নাড়াল, যে দুটো মট মট করে শব্দ বের হল। কিন্তু ওর শরীরটা আচমকা একটু বড় বড় লাগছে না?

প্রতিভাস তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল, “কে? কে তুমি?”

প্রতিভাসের প্রশ্ন শুনে, ঠোঁটের কোলে এক অদ্ভুত হাসি খেলে যায় রোজিনার। তারপর ঠিক সাপের মত হিশহিশে স্বরে বলে ওঠে,

“হাওরের হাওয়া... হাওরের পানি

আলাকুতি বিবি... হাওরের রানি...”

“মানে কী বলছো এসব?” প্রতিভাসের দুই চোখে ভয় বিস্ময় মিলে একাকার।

“বন্ধন সাহেব একটা কথা বলেছিল মনে আছে, শেষে যে থাকবে, সে যেন ভুলেও বিবির হাতে, ধরা না পড়ে। তার চেয়ে ভালো আত্মহত্যা করা। আবার সেখানেও সাবধানবানী। মড়ার চোখের

ছায়ায়, যেন আলাকুতির ছায়া না পড়ে, নাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সেই সর্বনাশটা কী জানো? আলাকুতি বিবির একটা অংশ সেই মড়ার মধ্যে প্রবেশ করে, সেই মড়াকে বাঁচিয়ে তোলে। সেই মড়ার ভিতরে থাকে আলাকুতি বিবির একটা অংশ মাত্র। যার প্রথম কাজ থাকে, এই হাওর থেকে বেরানো। তারপর, কোন একসময় সুযোগ বুঝে ঠিক হাওরে ফিরে আসা, একহাউস বোট ভর্তি মানুষ নিয়ে, যা কিনা আলাকুতি বিবির খাবার।“

মোবাইলের আলোয় কী ভয়ঙ্কর ক্রূর লাগছে রোজিনাকে। দেখে কে বলবে, এই মেয়েকেই একটু আগে সকলে সহানুভূতি দেখিয়েছিল। কিন্তু প্রতিভাসের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না কথাগুলো। এই মেয়েটা কী বলছে এসব।

“বিশ্বাস হচ্ছে না? তাই না? চলো তোমায় বিশ্বাস করাই...” কথাটা বলতে বলতেই, নিজের হাতের গ্লাভস খুলে মাটিতে পড়ে থাকা প্রতিভাসের দিকে এগিয়ে এলো রোজিনা। আচ্ছা, এক মুহূর্তের জন্য ওটা কী দেখল এক্ষুনি প্রতিভাস? রোজিনার জিভটা কী কুচকুচে কালো রঙের? সাপের মত মাঝখান থেকে চেরা? বুঝতে পারল না সে, কারণ রোজিনা ততক্ষণে, তার কাছে এসে পড়েছে।

তুমি যেমন ময়নামুখীর ময়নামুখীর প্যাসেঞ্জার ছিলে? এই মেয়েটি কয়েকবছর আগের তোমার আগের বোট মহামতী ফেরির যাত্রী ছিল। তোমাদের মত, এর বোটেরও সকলে মারা যায়, তোমার মত বাকি থাকে এও, তারপর কী হল দেখবে...? কথাটা বলেই নিজের দুটো হাত চেপে দিলো সে প্রতিভাসের কপালের দুই দিকে। মুহূর্তের মধ্যে, প্রতিভাসের সমস্ত শরীর জুড়ে তীব্র দহন, আর জ্বালাপোড়া। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল প্রতিভাস। কিন্তু তার মধ্যেও কতগুলো দৃশ্য ছবির মত সরে যাচ্ছে।

কাপড় মুখে ঢাকা একটা মেয়ে, তিনতলা বোটের রেলিঙের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, গলায় ফাঁস দিয়ে। আচমকা ছাদের দরজা দড়াম করে খুলে গেলো। মেয়েটা চিৎকার করে কী একটা বলতেই, একটা কালো ছায়া ধেয়ে এলো মেয়েটিকে ধরবে বলে, সাথে সাথে মেয়েটি ওপর থেকে ঝাঁপ দিলো। মটাক করে ঘাড়টা ভেঙে ঝুলতে লাগলো তার ভারী শরীর। একটা কালো ধোঁয়া ধীরে ধীরে নেমে এলো সেই কাপড় বেয়ে, তারপর ফিসফিস করে কী একটা বলতেই, মেয়েটির, মুখের কাপড়ের বাঁধন খুলে গেলো আপনা থেকেই। এ কী? এ যে রোজিনা বানু। জিভ একদিকে বের হওয়া, চোখ গুলো বড় বড়। আচমকা, মেয়েটির চোখের মণিতে সেই কালো কুণ্ডলীর ছায়া পরেই, প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁপতে লাগলো রোজিনা বানুর শরীরটা। তারপর আচমকা স্থির হয়েই, ওই ঝুলন্ত অবস্থাতেই চোখ মিলে তাকালো সে। ঠোঁটের কোলে, একটা ভয়ঙ্কর ক্রূর হাসি। দড়ির খেলায়, খেলোয়াড়েরা যেমন উঠে আসে, দড়ি বেয়ে, থিক তেমনভাবেই রোজিনা বাবু, ঠিক সেখানেই উঠে গেলো যেখান থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল। একটু পরেই, দেখ গেলো, একটা ডিঙি এগিয়ে যাচ্ছ সামনের দিকে। সামনে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে রয়েছে দুলা। আবার একটু পরে দেখা গেলো, ঘাটের কিছুটা আগে, রোজিনা, ডিঙি থেকে জলে নেমে তারপর অন্ধকারেই সাঁতরে পাড়ে উঠে গেলো। তারপর দূর থেকে দেখতে লাগলো, দুলা নৌকা সমেত একটু একটু করে ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে...

প্রতিভাসের কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিলো রোজিনা। এখন ওকে দেখতে আরো ভয়ঙ্কর লাগছে।

“ সকলের চোখ এড়িয়ে এই নতুন দেহ নিয়ে নতুন পরিচয়ে আমি ঢাকায় যাই। সেখানে গিয়ে আমি কৌশলে, বিত্তবান মোহম্মদ, মহাসীন আলমকে ফাঁসাই যে একাধারে অহংকারী, জেদি, এক গুঁয়ে, এবং সকলেই তার কাছে নগণ্য এমন ভাবনা পোষণকারী। কিভাবে ফাঁসাই, সে ইতিহাস আপাতত গোপন থাক। কেন ফাঁসাই? কারণ যে ট্রাভেল এজেন্সির মারফত আপনারা এসেছেন, সেই কোম্পানির পঁয়ত্রিশ পারসেন্ট শেয়ার হোল্ডার ছিলেন ওই লোক। এটা তোমরা কেউই জানবে না। আমারই পরামর্শে, ওই ট্যুর প্যাকেজের শেষ ডেসটিনেশন ছিল হাওর। তাও আবার এইদিনেই। আমিই সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে নাকের বাঁধন খুলে, মাছের আঁশটে গন্ধ নিয়েছিলাম। আর আমিই সেই যে এই লকেটটা সরিয়েছিলাম।“

কথাটা বলেই, রোজিনা, সালোয়ারের পকেট থেকে, একটা কালো কাপড়ে মোড়া জিনিস, মেলে ধরল প্রতিভাসের সামনে। সবুজ পাথরওলা, বন্ধনবাবুর সেই লকেট। সুরাইয়া তাবুসি।

প্রতিভাস হাত বাড়িয়ে সেটা ছিনিয়ে নিতে গেলো কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই, রোজিনা হাতটা সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো, “উঁহু... একদমই না...”কথাটা বলেই সে জিনিসটা ছুঁড়ে দিলো অন্ধকার হলঘরের দিকে।

তোমার ভেতরে যদি সত্যি আলাকুতির অংশ থেকে থাকে, তাহলে ওটা যখন ঝুমুরের রূপ ধরা আলাকুতিকে তাড়াতে পেরেছিল তাহলে তোমায় নয় কেন? তুমি তো ওখানেই ছিলে?”

“এই দেহের ভিতরে যেহেতু আলাকুতির বাস। তাই ওই জিনিস যতক্ষণ আমার শরীর স্পর্শ করে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। দেখলে না, আমি জিনিসটাকে কেমন কালো কাপড়ে মুড়ে রেখেছিলাম। ওটা তো আমি স্পর্শ...“

কথাটা বলতে বলতেই থমকে গেলো রোজিনা। বাতাসে শ্বাস উঁচিয়ে কীসের যেন গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করল।

“কিন্তু কেন? যখন বেঁচেছিলে তখন তো ভালো মানুষ ছিলে? এখন তাহলে নৃশংসের মত, এতো মানুষের ক্ষতি...” প্রতিভাসের কথাটা শেষ হওয়ার আগেই খিলখিল করে, হেসে উঠল রোজিনা বানু। উফ! দেখতে কী ভয়ঙ্কর লাগছে তাকে।

“ওই লোকটার কথা শুনে সত্যি ভাবলে, আলাকুতি বিবি লোকেদের সেবা করতো? হাঃ হাঃ হাঃ” হাসতে হাসতে কোনমতে বলে উঠল সে, ওই লোকের কথা তোমরা সত্যি ভাবলে? আলাকুতি বিবি আসলেই ডাইনি ছিল। সেই গ্রামে গ্রামে ঘুরত, কার বাড়িতে কটা বাচ্চা আছে, দেখার জন্যই। সেখান থেকেই সুযোগ বুঝে বাচ্চাগুলোকে চুরি করতো। তারপর তাঁদের মেরে মাংস খেত। আসলে তার মানুষের মাংস খেতে ভালো লাগতো। কিন্তু বড়রা বাঁধা দেবে, কিন্তু বাচ্চারাতো আর বাঁধা দিতে পারবে না। তাকে কেউই ফাঁসায় নি। সে একটা বাচ্চা খুন করতে গিয়েই ধরা পড়ে গিয়েছিল...”

“তারমানে, তুমি এখন মানুষ মারো কোন প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে নয়? বরং...”

“আমি মানুষ মারি, কারন আমার মানুষের মাংস খেতে বড় লোভ...” কথাটা বলেই সুড়ুত করে একটা আওয়াজ করল রোজিনা বানু। সাথে সাথে, দাঁতের ফাঁকে সেই কালো চেরা জিভটা লকলক করে উঠল।

“নাও, অনেক সময় হয়েছে। ওদিকে আবার ফিরতে হবে। দুলাটা নিজেকে শেষ করে দিয়ে, আমার ফেরাটা কঠিন করে দিলো। এখন মাসুদকে নানান ভাবে বোঝাতে হবে। এইবার বাকীদের মত তোমায় শেষ করলেই…”

“আমি তোমায় জিততে দেবো না আলাকুতি... কিছুতেই না...”

কথাটা বলেই প্রতিভাস সাথে সাথে, একটা ছু রি নিয়ে নিজের গলায় গাঁথ তে লাগলো বারবার বারবার বারবার। ফিনকি দিয়ে র ক্ত ছড়িয়ে পড়ল রান্নাঘরের মেঝেতে। বাসনের তাকে ধাক্কা খেয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কখন যে রোজিনার অলক্ষ্যে সে নিজের হাতে ছুরি তুলে নিয়েছিল সেটা রোজিনা টের পায়নি।

আসতে আসতে নিস্তেজ হয়ে একপাশে গড়িয়ে পড়ল প্রতিভাসের শরীরটা।

রোজিনা, ধীরে ধীরে, প্রতিভাসের নিস্তেজ শরীরের কাছে হাঁটু মুড়ে বসলো। তারপর তার স্থির চোখের তারার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল,

“হাওরের হাওয়া হাওরের পানি

আলাকুতি বিবি... হাওরের রানি...”

•••

“আপনি বাইচ্যা আসেন?”

প্রতিভাস দেখল, অন্ধকারের মধ্যেই বোটের পেছন দিক থেকে মাসুদ, ডিঙিটা জলে নামানোর চেষ্টা করছে। প্রতিভাস হন্তদন্ত করে, সেখানে উপস্থিত হতেই মাসুদ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, “কই আসিলেন আপনি?”

“মাসুদ ভাই, এত প্রশ্ন করবার সময় নেই। আমাদের এক্ষুনি এখানে পালাতে হবে, সেই ভয়ঙ্করী মহাসিন বাবুর স্ত্রীকে গিলছে। আমাদের হাতে সময় বড় কম...”

“হ, ঠিক। হাত লাগান। এই ডিঙি ম্যালা ভারী।“

মাসুদ আর প্রতিভাস, দুজনেই নিচু স্বরে কথা বলতে বলতে ডিঙিটাকে জলে নামাল। তারপর ঝটপট ডিঙিতে দুজনে উঠে, দুজনেই দুহাতে দুটো দাঁড় তুলে নিলো।

“আর কেউ বাইচা নাই? আর কেউ যাইত যদি...”

মাসুদের কথায়, প্রতিভাস মাথা নাড়াল জোরালোভাবে। "নাহ, আর কেউই বেঁচে নেই। এবার চলুন। আগে নিজের কথা ভাবতে হবে।"

মাসুদ অন্ধকারেই একবার তার মুখের দিকে তাকালো, তারপর বিড়বিড় করে বলল, চলেন তাহলে, "কিন্তু যাইব কোন পানে। কিছুই দেহা যায় না।"

"আমি বলছি। আপনি দাঁড় বাইতে থাকুন..."

কিছুক্ষণ ওরা এই অন্ধকারেই নিরবিচ্ছন্ন ভাবে দাঁড় বাইতে বাইতেই, আচমকা প্রতিভাসের চাপা স্বর শোনা গেল, "মাসুদ ভাই, ওই দেখুন। ওটা কী?"

মাসুদ ঘাড়ঘুরিয়ে দেখল, হাওরের ঠিক মাঝ বরাবর এক জায়গায়, কুয়াশা যেন ঘন হয়ে একটা বিরাট আকৃতির দেওয়াল তৈরী করেছে।

"আমার মনে হয়, ওই কুয়াশার ভেতরে প্রবেশ করলেই, আমরা মরা হাওর থেকে আমাদের নিজেদের জগতে ফিরে যেতে পারবো।"

"তাহলে চলেন জলদি।" কথাটা বলেই দুজনে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড় বাইতে বাইতে সেই দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর, ওদের মনে হল, ওদের ডিঙি যেন, অদৃশ্য শক্তিতে আপনা থেকেই সেইদিকে টানা হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের কিছুই করতে হচ্ছে না।

"মাসুদ ভাই ছেড়ে দিন। এরপর আমরা এমনিই পৌঁছে যাব। চুপ করে বসে থাকুন।"

প্রতিভাস কথাটা বলেই টের পেল, মাসুদ তাকে কিছু একটা বলবার জন্য তাকে হাতের ইশারায় নিজের কাছে ডাকছে। বোধয় লোকটা কিছু কানে কানে বলতে চায়। প্রতিভাস কিছুটা এগিয়ে, শরীরটাকে সামনে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতেই, সে টের পেল, মাসুদ যেন, আচমকাই তার গলায় কী একটা পরিয়ে দিয়েছে।

চমকে উঠে নিজের জায়গায় বসতে গিয়ে প্রতিভাস টের পেল, সে নড়তে পারছে না। শরীরটা পাথরের মত ভারী হয়ে গিয়েছে। সুরাইয়া তাবুসি। বন্ধন সাহেবের সেই লকেট। যেটা রোজিনা, ছুঁড়ে দিয়েছিল, অন্ধকার হলঘরের দিকে।

মাসুদ হেসে বলল, "তুমি খেয়াল করো নাই। আমি কিচেনের আড়ালে দাঁড়াইয়া তোমার সব কথা শুনসি। কিন্তু তুমি বুঝতে পারো নাই ক্যান জানো, কারণ আমি নাক ঢাকা দিয়া আসিলাম। তুমি আর পারবা না বিবি। আর চালাকি কইরা লোক আনতে পারবা না আমাদের দুনিয়া থিকা। এই খেলা ইখানেই শেষ হইব। কারণ তুমি এইহানেই থাকবা। এই লকেট তোমায় এইহান থিকা বেরোইতে দিবা না। আর তুমি না বেরইলে, নতুন কেউ আসবেও না। এই মরা হাওরেই..."

কথাটা বলে, সাথে সাথে প্রতিভাসের বুকে সজোরে একটা লাথি কসালো, মাসুদ। সাথে সাথে দেহটা ডিঙি থেকে ছিটকে পড়ল হাওরের জলে। মুহূর্তেই শরীরটা ডুবে গেল হাওরের কালো জলে। আর ঠিক তারপরেই একটা ঝটকা টান পুরো ডিঙিটা জুড়ে। তারপর ভয়ঙ্কর একটা ঝাঁকুনি।

কুয়াসার বলয়ে প্রবেশ করেছে তার ডিঙি। মাসুদ একবার শেষ বারের মত দেখতে চাইলো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা তার ময়নামুখীকে। পারল কী? কে জানে?

*****

“আপু... বাচ্চাটারে লইয়া অনেকক্ষণ আসিলেন ডিঙির বিতরে। কষ্ট হইসে?”

দাঁড় বাইতে বাইতে ঈষিকার দিকে তাকালো মাসুদ। ঈষিকা মাথা নাড়াল। সে পরম মমতায় টুকুসোনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

তিনতলা থেকে নেমে যখন মাসুদ ডিঙির কাছে পৌঁছেছিল, সেখানে গিয়ে দেখল, ঈষিকা বাচ্চাটিকে নিয়ে ডিঙির আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। মাসুদ ঝটপট তাঁদের নাকগুলো বেঁধে, ডিঙির ভিতরে শব্দহীন ভাবে লুকিয়ে থাকার নির্দেশ দিতেই কিচেন থেকে ভেসে আসে বাসনের ঝনঝনানি। মাসুদ দেরী না করে, সেখানে উপস্থিত হয়ে পুরো ব্যপারটা নিজের চোখে দেখে, সব রহস্যর উত্তর খুঁজে পায়। আর ঠিক কী করে, একে আটকাবে, সেটাও ভেবে ফেলে মনে মনে।

“কী করবেন আপনি এরপর?”

“এইহানের লোকজন আমারে অপয়া ভাববে আমি জানি। আগে মাইয়ার চিকিৎসা করাইতে ইন্ডিয়া লইয়া যামু। তেমন হইলে, এই জায়গা ছাইড়া দিমু। আর আপনে?“

ঈষিকা টুকুসোনার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে উঠল, “আগে, দেখবো এর কোন আত্মীয় একে নিতে চায় কিনা। নইলে আমিই মানুষ করবো।“ কথাটা বলেই একটা জোরে শ্বাস নিলো সে। চোখের দৃষ্টি পুবের আকাশে। ওদিকটা একটু একটু করে ফর্সা হচ্ছে। নতুন সকাল হচ্ছে।

সমাপ্ত